সমী ও দীপ্তি

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট
[জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ]
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বদেশের শিক্ষাব্রতে অগ্রণী,
বাণীর একান্ত অনুরাগী ঋত্বিক,
শিক্ষাযজ্ঞের একনিষ্ঠ সত্যব্রত
পুরোহিত, কলিকাতা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-
চ্যান্সেলর পরম শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ
মুখোপাধ্যায়ের কর-
কমলে এই সামান্য গ্রন্থখানি
শ্রদ্ধার সহিত নিবেদিত হইল।

—বিনীতা গ্রন্থকর্ত্রী
শ্রীমতী আশালতা সিংহ,
(বীরভূম)—১. ১. ৪৬

সমী ও দীপ্তি

[এক]

সমস্তদিন বর্ষণের পর বর্ষণক্লান্ত আকাশে অপরাহ্ণের আলো সজল এবং বড় করুণ লাগিতেছে। কাটা-ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। অস্তগামী রশ্মি মেঘস্তূপের উপর ম্লান হইয়া পতিত হইয়াছে। বাইরের বারান্দায় সমী একটা অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট হাতে চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বর্ষা-অপরাহ্ণের এই আর্দ্রতা এবং স্নিগ্ধতা তার ভালো লাগিতেছিল। মনের মধ্যে যে সকল ভাব আনাগোনা করিতেছিল তাহাকে বস্তুতান্ত্রিক ভাবও বলা যায় না, অবিমিশ্র কল্পনা বলিলেও হয়তো ঠিকটি বলা হয় না। স্মৃতিতে, বেদনায়, করুণতার সৌন্দর্য্যে তাহা এক প্রকার স্বপ্ন—যে স্বপ্নের ঘোর মাঝে মাঝে আমাদের জীবনে না লাগিলে তাহার রূপ এবং রঙ দুই-ই ফিকা হইয়া যায়। এমন সময়ে শ্রীমতী দীপ্তি পেয়ালায় করিয়া ধূমায়িত চা লইয়া সেখানে আসিলেন। কিন্তু সমীর এই একটা অত্যন্ত দোষ, মনের ভাব যাহাই থাকুক ঠিক তাহার উল্টা কথাটি বলিয়া দীপ্তির সহিত তর্ক করা চাই-ই। সে বলে, এরূপ তর্ক করাটা মানসিক পদচারণা। আজও তাহাকে দেখিয়া সমীর তর্ক করিবার প্রবৃত্তি উদ্দাম হইয়া উঠিল। চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া সে আর একখানা কেদারা অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিল, ব'সো। দীপ্তি শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার বাহিরের আকাশ, একবার সমীর হস্তধৃত চায়ের পেয়ালা এবং আর একবার তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, কিন্তু আমি গৃহান্তরে রান্না চড়াইয়া আসিয়াছি। তোমার ঐ বলিবার

ভঙ্গী হইতে মনে হইতেছে আজ হয়তো তরকারীতে নুন দিয়াছি কিংবা যাইয়া দিব একথাটা আর মনে পড়িবে না। সমী বলিল, তা হোক। অ[illegible] ঐ বর্ষণক্ষান্ত আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইতেছে তরকারীতে যদি নুন কম হয় এবং পানে যদি চূর্ণ বেশী হয় জীবনে সে কথাটা খুব একটা বড় কথা নয়।

দীপ্তি হাসিয়া কহিল, তাই নাকি ?

সমী বলিল, হাঁ তাই। কিন্তু এই মূহূর্ত্তগুলি ক্ষণিক। জীবনের বেশির ভাগ সময়েই আমরা পান হইতে চূণ খসিলে অস্থির হইয়া উঠি। বর্ষার আকাশকে তখন ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র বলিয়া বোধ হয়, মেঘদূতকে এক অলস যক্ষের প্রলাপবাণী বলিয়া মনে মনে অবজ্ঞার হাস্য করিয়া থাকি। তখন আমাদের এ সকল অপেক্ষা অপিসের বড়বাবু এবং ব্যাঙ্কের ব্যালান্সকে ঢের অধিক সত্য বলিয়া মনে হয়। আমি এক এক সময় অবাক হইয়া ভাবি, আমাদের জীবনে বাস্তবই বেশি সত্য, না এই ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া ওঠা মূহূর্ত্তগুলি বেশি সত্য? এই কথাটা আজ যাচাই করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

দীপ্তি কহিল, কোনটাই মিথ্যা নয়। তুমি যাকে ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত মূহূর্ত্ত বলিতেছ, সে গুলি আমাদের জীবনের আলো। কিন্তু আলোটা সত্য বলিয়া অন্ধকারটাও লেশমাত্র অসত্য নয়। তাই আবার মনে হয় আজকালকার অনেক নব্যপন্থী লেখকরা যে এই আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বিদারণ-রেখা টানিয়া দিয়া সমস্বরে কহিতেছেন, "আলোটা কিছু নয়,

অন্ধকারটাই একমাত্র সত্য"। এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধ দল আরও জোরে বলিতেছেন, "মোটেই না। ওটা তোমাদের অন্ধ রিয়ালিজম্, আসলে অন্ধকার যদি বা থাকে, তাহাকে অন্ধকারে চাপিয়া রাখা দরকার। আলোটাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া প্রচার করা প্রয়োজন"।—এ ব্যাপারটাও খুবই অযৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের নায়ক যতীনের মুখের একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। যতীন বলিয়াছিল, 'জীবনের সুখগুলি আকাশের ঐ তারার মত। ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়। সমস্ত অন্ধকারটা লেপে রাখে না। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলেনি?" —এখন এই সুন্দর কথাটির অর্থ আমরা যদি অনুভব করিতে না পারি, বরঞ্চ কোমর বাঁধিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হই যে, ঐ মিট্‌মিটে তারাগুলির কচিৎ দীপ্তির চেয়ে আকাশের সীমাহীন অন্ধকারের বিস্তৃতিটা ঢের বড় অতএব ইত্যাদি···ইত্যাদি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের চরিত্রের সঙ্গতিজ্ঞান নেই।

সমী চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, স্ত্রীলোকমাত্রেই ভাবপ্রবণ। অমনই তুমি ঠেশ দিয়া নব্যপন্থী লেখকদের কথা পাড়িয়া বসিলে! কিন্তু আজকাল একদল লেখক যে বলেন, জীবনে যাহা ঘটে তাহাকে দেখাইব না কেন? এবং জীবনে যাহা ঘটে না সেই অবাস্তব কথাকেই বা কল্পলোকের রঙ চড়াইয়া দেখাইব কেন?—এ কথাটার মাঝে কি সত্যের লেশ নাই? ধর, যদি কেহ বলেন, বাস্তব জগতে কি পথে ঘাটে

সুচরিতা বা ললিতার সাক্ষাৎ মেলে, না বাংলাদেশে একমাত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া লাবণ্য বা অমিতরায়ের ছাঁদে কেহ কথা বলিতে পারে ?—তা যখন পারে না তখন তাহাদের সৃষ্টি করিবার কৈফিয়ৎটা কি ?—তবে তাদের সে কথাটা কি একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু ?

দীপ্তি ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, এমন কথা যে উঠিতে পারে তাহাই আমার জানা ছিল না। অমিতরায়, লাবণ্য বা সুচরিতাকে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে হয়তো দেখিতে পাইনা, আমাদের জগতে হয়তো তাহারা নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জগতে তাহারা আছে এবং সে জগৎ হইতে শরীরী হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তুমি কি মনে কর আমাদের বাস্তব-জগৎটাই সত্য আর যে জগৎ হইতে সুচরিতা-ললিতার সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে সেটা ইহার চেয়ে কিছুমাত্র অসত্য ? তা নয়। আমার মনে হয় যাঁহারা এই কথা বলেন, বাস্তবজগৎ বলিতে তাঁহারা কি বোঝেন সে কথাটার নিশানাই হয়তো এখনও স্পষ্ট হয় নাই। আমরা দু'চোখ মেলিয়া যাহা দেখি এবং কাণ পাতিয়া যাহা শুনি সেইটাই কি বাস্তব ? ইহা ব্যতীত আর কোন বাস্তব কি নাই ? তাই যদি হইত তবে কবির কাব্য কেবলমাত্র আমাদের প্রতিদিনের প্রাত্যহিক ঘটনার দিনলিপি হইত। এবং শীত শেষের পুঞ্জিত শুষ্ক পত্র-রাশির মত তাহাও কিছুকাল পর অবজ্ঞাত হইয়া ঝরিয়া যাইত। অথচ তাহা তো হয়না। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য আমাদের

চিরদিনের আনন্দলোকের বস্তু হইয়া থাকে। অথচ সে যদি শুধুই কল্পনা হইত, জীবনমূলের কোন অন্তর্নিহিত গূঢ় বাস্তবের সহিত যদি তাহার সংযোগ না থাকিত তাহা হইলেই বা সে টিঁকিত কেমন করিয়া? আমরা কখনো কখনো বুঝিতে পারি আমাদের বাহ্যিক জীবনের অন্তরালে কোন এক সৌন্দর্য্যের উৎস আছে। সকল সময় তাহা প্রকাশমান নয়। নানা দৈন্যে নানা অবান্তরতায় তাহার প্রকাশ প্রতিহত। কবির দৃষ্টি সেই দৈন্য ভেদ করিয়া সে অন্তরাল ছিন্ন করিয়া ফুলের মত ফুটাইয়া তোলে আমাদের সংগুপ্ত সুষমা এবং সামঞ্জস্যকে। এ যদি না হইত তবে কেবলই কল্পনাবিলাস লইয়া কবির কাব্য কখনই আমাদের প্রাণের গভীরে আসন পাইত না।

সমী কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, ও গেল তোমার বড় বড় কথার বুদ্বুদ মাত্র। প্রাণের গভীরে কি বস্তু আছে আজও তাহা অবধান করিয়া দেখি নাই। বরঞ্চ সাদা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আপাতদৃষ্টিতে আমরা চারিদিকে যাহা দেখিতেছি তাহার কুশ্রীতা লোপ করিয়া তাহাকেই দস্তুরমত সজ্জিত বসন-ভূষণ পরাইয়া কবি একটা জিনিষ খাড়া করেন। সেটা দেখিতে মনোরম হয় বটে কিন্তু সত্য হয় কিনা কেমন করিয়া বলিব।

দীপ্তি কহিল, সত্য কথাটার আসল মানে কি তাই আগে বলো ত? বেশী কথায় কাজ কি, তোমার নিজের কথাই ধর। তুমি যখন ভৃত্যকে রুক্ষ ভাষায় তর্জ্জন কর তখন তোমার যে রূপ ফুটিয়া ওঠে সেইটাই কি তোমার জীবনের একমাত্র

সত্য আর তুমি যখন তোমার সমস্ত অস্তিত্বকে একটি গানের সুরের মত অনির্ব্বচনীয় করিয়া প্রেয়সী নারীর কাছে নিবেদন কর, তখনকার পরিচয় কি একেবারেই অসত্য? এই মানুষের জীবনের হাটে নিমেষে নিমিষে কত রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে। কবি জানে কেমন করিয়া রূপ বাছিয়া লইতে হয়। একটা মানুষের ছড়াইয়া পড়া সহস্র বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ পরিচয় হইতে কবির মানসপটে ভাসিয়া ওঠে একটা সমগ্র সত্তা। সে সত্তা হইতে আমরা মানুষকে বৃহৎ এবং সুন্দর বলিয়া জানিতে পারি।

সমী কহিল, কিন্তু মানুষ কি সত্যই তাই?

দীপ্তি কহিল, এ কথার উত্তর আমিও জানি না তুমিও জান না।

সমী কহিল, মানুষের কি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, প্রবৃত্তি এ সকল নাই?

দীপ্তি কহিল, অথচ ইহার চেয়েও আশ্চর্য্য যে, এত সব থাকা সত্বেও তাহার মধ্যে অমৃতের পিপাসা আছে।

সমী বলিল, তবে মানুষের কোন্ রূপকে সত্যরূপ বলিব?

দীপ্তি বলিল, যে রূপ মানুষের ধ্যানের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে সেই রূপই তাহার সত্য রূপ।

সমী বলিল, আমি বাপু তোমার ওসব বড় বড কথা বুঝিতে পারি না। আরও একটু সহজ ভাষায় বল।

দীপ্তি কহিল, খুব সহজ কথায় বলিতেছি। তুমি যখন গলদঘর্ম্ম হইয়া টাইটা সোজা করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে অফিসে

ছুট কিম্বা মশারিটা উট্‌মুখো করিয়া টাঙ্গাইবার জন্য চাকরটাকে যা নয় তাই বলিয়া বকিতে থাক, তোমার- ঐ-অংশকার রূপটা আমার কাছে সত্য নয়। কিন্তু অনেক দিন যে দেখিয়াছি অন্ধকার আকাশের তারাগুলির দিকে চাহিয়া তোমার মন জীবনের এই অভ্যস্ত উপকূল ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিংবা সূর্য্যাস্তের অতল প্রশান্তির মাঝে ডুব দিয়া সমস্ত মন উদাস ও বিধুর হইয়া উঠিয়াছে ;—তোমার সেই ক্বচিৎ-উদ্ভাসিত-হইয়া-ওঠা যে রূপ, তাহাই আমার কাছে সত্য। বিশ্বমানবের সেই ক্বচিৎ-দীপ্তিকে প্রকাশিত করিয়া তোলাই কবির সাধনার বস্তু।

রবীন্দ্রনাথকে আজ সমস্ত জগৎ অর্ঘ্য দিয়াছে, তাহার কারণ তিনি এই বস্তুকে তাঁহার সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। অন্ধকার আকাশের ফাঁকে ফাঁকে তারাগুলি যেমন দেখা যায়, আমাদের প্রতিদিনের পুঞ্জীভূত কর্ম্মরাশির আচ্ছাদনের বিরল অবকাশে যে স্বর্গের আলো নিভৃতে জ্বলিতেছে, সেই দীপশিখাকে তিনি আমাদের নয়নগোচর করিয়াছেন।

ধর ঐ চতুরঙ্গের ননীবালা ও পুরন্দরের ব্যাপারটা। কোন একজন আধুনিক লেখকের হাতে পড়িলে হয়তো তাহার অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একটা পরিণতি হইতে পারিত। হয়তো ননীবালা বক্তৃতার অন্তে কোন একটা সেবাসদনে আসিয়া ভর্ত্তি হইত। হয়তো এ ছাড়াও আরও অপর অনেক কিছুও হইতে পারিত। এবং হয়তো অনেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বাহবা দিয়া বলিতে পারিতেন, 'বাঃ চমৎকার। এই তো সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায়

বলিবার দুঃসাহসিক রীতি।' কিন্তু শচীশ যখন তাহার ডায়েরিতে ননীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া লিখিল, 'ননীবালা মরিয়া আমাকে নারীর আর এক রূপ দেখাইয়া গিয়াছে। যে নারী মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণ করিয়া তুলিল'—যখন দেখি উপদ্রুত অবমানিত নারীচিত্ত মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিয়াছে তাহার স্নিগ্ধ কিরণ ননীবালার কলঙ্কিত জীবনকে ছাপাইয়া বহু বহু দূর দিগদিগন্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদিচ সংসারে ঠিক এইরূপটি ঘটে কিনা তাহা আমরা কেহই হলফ্ করিয়া বলিতে পারি না, যদিচ অহরহ চারিপাশে যাহা ঘটিতেছে তাহা হইতে অন্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি অন্যকে কতদূর ঠকাইয়াছেন এবং কি পরিমাণে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন তাহাও নিরূপণ করিবার সাধ্য নাই, কিন্তু নারীর যে পরিচয় জীবন সমুদ্রে একটি পরিপূর্ণ শতদলের মত সৌন্দর্যে, করুণায়, অশ্রুতে টলটল করিতেছে এবং জীবনের নানা অবান্তরতায় যাহা আচ্ছন্ন, ক্ষণিকের জন্য অবরুদ্ধ আলোকের সেই যবনিকা তুলিয়া তিনি তাহাই আমাদিগকে দেখিতে দিয়া আমাদের চরিতার্থ করিয়াছেন।

[বাস্তব ও কল্পনা

[দুই]

শ্রীমতী দীপ্তি কিছুকাল হইতে আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে কিছু কিছু তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। সেদিন সকাল বেলাতেও এই প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার সহিত কিছু মতান্তর ঘটিল।

সমী কহিল, আচ্ছা, একটা কথা সত্য করিয়া বল দেখি। এই যে অশ্লীলতার অভিযোগ লইয়া আজকালকার অনেক তরুণ লেখককে তোমরা গালাগালি দিতে থাক এবং কথায় কথায় কোটেশন দাও, রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনীর মত কবিতায় এতখানি দেহের প্রসঙ্গ আনিয়াও শুদ্ধ স্নুন্দর সৌন্দর্য্যের কমল একটুখানিও বিকৃত হয় নাই, কালিদাসের শকুন্তলার কথা বলিতে বলিতে গদগদ হইয়া উঠ, রসনাগ্রে তৎক্ষণাৎ আসিয়া পড়ে সেক্সপীয়রের কথা। কিন্তু সেক্সপীয়র কেবলমাত্র সপ্তদশ শতকে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই কি এমন কথা মানিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহার সমগ্র রচনায় কোথাও নাই একটুখানিও স্থূল ভাঁড়ামি, একটুখানিও কদর্য্যতার দৃশ্য? আর শকুন্তলা নাটকখানার কথাও কি আবার দুইবার করিয়া বলিয়া দিতে হইবে? আমার আজও বেশ মনে পড়ে, আমাদের কলেজের সংস্কৃত-পণ্ডিত, শকুন্তলা নাটকখানার যেখানে কুঞ্জবনের মাঝে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম প্রেম-সঞ্চারের কাহিনী এবং কথোপকথন আছে সেইখানটা পড়াইতে বসিয়া কতবার হাঁচিয়া কাশিয়া লাল হইয়া দু' একবার ঢোঁক গিলিয়া অবশেষে থামিয়া যাইতেন। আমার তো মনে হয়, সত্যই

কাব্য এবং সাহিত্যে যাহা কিছু পড়িয়াছি শকুন্তলার অনেক দৃশ্যের মত অশ্লীল আর কোথাও পাই নাই। কিন্তু তোমরা সে কথা মানিবে না। যেহেতু কালিদাস আধুনিক লেখক নহেন এবং যেহেতু তিনি বহু শতাব্দী পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন তখন আর কথা কি? তাঁহার রচনার আগাগোড়া কোথাও অশ্লীলতা নাই। এই তো তোমাদের মত?

দীপ্তি কহিল, আমাদের মত কি, সেকথা বলিবার আগে তোমাকে একটা কথা বলিয়া রাখি। কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা যে ব্যাপারটি ঘটাইয়াছিলেন, আধুনিকতম কোন সভ্য সমাজে ঠিক সেইরূপ একটি ব্যাপার ঘটিলে চারিদিকে একটা একটানা ছি ছি—রব উঠিত, অথচ সেই শকুন্তলা নাটক বিশ্বসমাজের লোকে পড়িয়া মাধুর্য্যে আপ্লুত হইয়া উঠিতেছে। ইহার ভিতরের কথাটাই বা কি?

সমী—কথাটা আর কি, কথাটা এই যে শকুন্তলা কাব্য হিসাবে অতুলনীয়।

দীপ্তি—না, তা নয়। এই কথাটারই উত্তর শরৎচন্দ্র তাঁহার লেখায় বড় সুন্দর করিয়া দিয়াছেন। মনে হইতেছে, কিছুদিন আগে কি একটা কথা প্রসঙ্গে আরও একবার যেন তোমাকে সেই কথাটা বলিয়াছিলাম। তিনি ইহার উত্তর দিয়াছেন, "কিন্তু সেকালের শকুন্তলাকে কেন যে একালের কোন নর-নারীই অন্তরে অন্তরে মন্দ বলে ঘৃণা করতে পারে না, এইটেই বিচিত্র।" ঘৃণা কেন যে করতে পারেনা জানো? পারেনা এই জন্যই যে,

মিলন তাঁর যে ভাবেই হোক্, মিলনের আদর্শকে তিনি খাঁটি রেখে-ছিলেন। যে বন্ধনে এক মুহূর্ত্তেই নিজকে চিরদিনের মত বেঁধে ফেলেছিলেন সে বন্ধন পাকা নয় বলে মনের মধ্যে কোন সংশয় কোন সঙ্কোচ রাখেন নি।"

শকুন্তলার কাব্য অংশ যতই অতুলনীয় হোক, যদি না তাহার সমস্তটা ব্যাপিয়া এমন একটি পরিপূর্ণতার আদর্শ থাকিত তবে হয়তো তোমাদের মত করিয়াই ভাবিতে পারিতাম এবং তোমাদের সুরের সঙ্গে গলা মিলাইয়া কহিতাম, সত্যই শকুন্তলার স্থানে স্থানে এমন সকল বস্তুর বর্ণনা রহিয়াছে যাহার চেয়ে নোঙ্‌রা রকম sexy জিনিষ প্রায়শঃ চোখে পড়েনা। তা সে কি একালের সাহিত্যে, কি সেকালের সাহিত্যে।

সমী—তোমার এই সাহিত্যের পরিপূর্ণতা জিনিষটা কি? আর একটু প্রাঞ্জল করিয়া না বলিলে তো বুঝিতে পারিনা।

দীপ্তি—বুঝাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি। জীবনকে যখন আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি তখনই যে তাহাকে চরম ভাবে বুঝিতে পারি এমন নয়। রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে কোন একটা বস্তুকে কাটিয়া কুটিয়া চিরিয়া, নানাদিক হইতে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য আর কাব্যের সত্য এক বস্তু নহে। তাই পণ্ডিত সমালোচকেরা কাব্যকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাহা হইতে চিনিয়া বাছিয়া অনেক সময়ে যে সার তত্ত্বটুকু বাহির করেন তাহার চেয়ে যথার্থ সহৃদয় ব্যক্তি, যে হৃদয় দিয়া কাব্যের রসকে পরিপূর্ণ ভাবে

এবং সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করিতে চায়,—তাহার বিচারের দাম অনেক বেশি। শকুন্তলাকে তুমি অমন খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিও না। তাহা যদি দেখিতে ব'স তাহা হইলেই চোখে পড়িবে, অমুক কথাটা শীলতার মাত্রা ঘেঁষিয়া গিয়াছে, ঐ দৃশ্যটা বেহায়াপনার প্রান্ত-সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। কিন্তু অরসিকের মত অমনই করিয়া বিচার না করিয়া শকুন্তলার সমগ্র জীবন দিয়া কবি কি কথা এবং কি আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন সেইটে মনে মনে একবার স্তব্ধ হইয়া ভাব দেখি। যে শকুন্তলাকে আমরা লতামণ্ডপে প্রেমবিবশা কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণে অসমর্থা এবং তাহারই সঙ্গে একটুখানি যেন বেহায়ার মত—"অসন্তোষে উন কিং করেদি ?—" বলিতে শুনিয়াছিলাম; তাঁহাকেই আবার কাব্যের শেষভাগে শুচিস্মিতা, তপস্যাপরায়ণা 'ধৃতৈক বেণী, নিয়ম ক্ষামমুখী—' রূপে দেখিলাম তখন তিনি প্রেমকাতরা শকুন্তলা নহেন, তিনি ভরতজননী।

আর যে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার সঙ্গে প্রথম প্রণয় সঞ্চারের বেলায় প্রেমের মধ্যে যে সাধনার পালা আছে তাহাকেই গিয়াছিলেন এড়াইয়া। যাঁহার রাজাবরোধের মাঝে আছে শত সহস্র সুন্দরী আর তাহারও চেয়ে সুন্দরতর, তাপস-কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার চোখে ঘোর লাগিয়াছিল, মনে রঙ ধরিয়ছিল। তাই তিনি অর্দ্ধস্ফুট কমলকোরকের মধুর স্বাদ একবার মাত্র লইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে মধু আস্বাদনের পরে রাজসভায় সন্তান-সম্ভাবিতা ক্লান্ত শকুন্তলাকে আর চিনিয়াও

চিনিতে পারেন নাই। সেই তো রাজা দুষ্মন্ত। কিন্তু কাব্যের শেষভাগে কবি দেখাইলেন, যে রাজা অবশেষে প্রেমের মধ্যে সাধনার এবং তপস্যার যে পালা আছে তাহাকে মানিয়া লইলেন। কাব্যের শেষে দুষ্মন্ত একাগ্র বিরহীচিত্ত লইয়া শকুন্তলাকে ধ্যান করিতেছেন।

রাজার প্রেমে যেটুকু অসম্পূর্ণতা ছিল তাহা পূর্ণ হইল। রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুর পরে' কবিতায় সেই যে কয়েকটি লাইন আছে ঃ—

"ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখ' তারে সর্ব্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া ;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখ' তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়োনা তারে।
থাক তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে।"

সেই লাইন কয়েকটির সঙ্গে সুর মিলাইয়া আমিও তোমাকে বলিতেছি, হে সমালোচক শ্রেষ্ঠ! কোন একটা প্রতিভাকে যখন বিচার করিতে বসিবে তখন তোমাদের ওইটুকু ক্ষুদ্র বাট্‌খারায় কুলাইবে না। অমন করিয়া ছিন্ন ছিন্ন ভাবে এ পংক্তিতে এতটুকু অশ্লীলতা আছে, ওই লাইনে এমন অভব্য কথা আছে যে, যাহা পড়াইতে সংস্কৃত পণ্ডিতের কর্ণমূল লাল

হইয়া উঠে, এমনতরো বিচারে চলিবে না। কবি অন্তরের কোন্ আদর্শকে কাব্যের সমগ্র ধারার সহিত মিশাইয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন সেই কথাটাই শ্রদ্ধার সহিত স্তব্ধভাবে আমাদের অনুভব করিতে হইবে। বলি, কথাটা আগের চেয়ে কথঞ্চিৎ প্রাঞ্জল হইয়াছে তো?

সমী হাসিয়া কহিল, যাহাও বা হইয়াছিল তোমার বক্তৃতার তোড়ে তাহাও ভাসিয়া যাইবার জো হইয়াছে। কিন্তু তোমার কি মনে হয় সাহিত্যে এই পরিপূর্ণতা একটা মস্ত জিনিষ? যে বস্তুর কারুকার্য্য অনিন্দনীয় তাহার অঙ্গ হইতে যে কোন একটা অংশ কাটিয়া লইয়াই তো আমরা বলিতে পারি জিনিষটা কী দরের।

দীপ্তি—ওই দেখ! সমালোচকপ্রবর আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। জিনিষটা কী দরের সে কথা লইয়া ব্যবসায়ের বাজারে মাথা ঘামাও কিন্তু সাহিত্যে দরের চেয়ে রসের দাম ঢের বেশী। আজকালকার লেখকদের একটা ফ্যাশান হইয়াছে বটে, তাহারা বলে যে, সাহিত্যে পরিপূর্ণতার এমন কি দাম? বলিবার ভঙ্গীটার বৈশিষ্ট্য থাকিলেই হইল। গল্প লিখিতে বসিলেই সব সময়ে তাহাকে একটা সুগোলত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং কোন এক স্থান হইতে আরম্ভ করিলেই তাহাকে নির্দ্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিতে হইবে, এমন নিয়ম যেকালে ছিল সেকাল গত হইয়াছে। কিন্তু হাল-আমলের লেখকেরা যাহাই বলুন এবং সমালোচকেরা যে নিয়মই বাঁধিয়া দিন, বড়

কবির কাছে আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা সর্ব্বসময়েই ধ্বনিত হইতেছে যে তিনি আমাদের মনকে যেমন বিচিত্র আনন্দের মধ্যদিয়া পথে বাহির করিয়াছেন বেলা শেষে তেমনি তাহাকে চিরমিলনের চিরসৌন্দর্য্যের দেশে নিশ্চয়ই পৌছাইয়া দিবেন। রবীন্দ্রনাথের সেই অনুপম কথা কয়েকটি একবার মনে করিয়া দেখ দেখি।

"সকল কবির কাব্যের গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবার তানের মধ্যে আকাশ পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

যে কবির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে, আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চ কাব্য শ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি, পুষ্পিত পথের মধ্যদিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্যগহ্বরের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। এইজন্য কোন কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দু'টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার পূর্ব্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন সিংহদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।"

সমী কোন জবাব দিল না। বোধ করি মনে মনে কথাগুলা ভাবিয়া দেখিতেছিল। দীপ্তি কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, সাহিত্যের আদর্শই যে হইতেছে পরিপূর্ণতা এবং ঐশ্বর্য্য। যে প্রকাশ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত নয় তাহা সাহিত্যের কোঠায় পড়ে না। তোমরা মনে কর যে, শুধু প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারেই সংযমের মাত্রা একটুখানি এদিক ওদিক হইয়া গেলে তাহা অশ্লীলতার কোঠায় পড়ে। কিন্তু তাহা নয়। যে কোন বিষয়ের অবতারণা করিতে বসিয়া তাহার সম্বন্ধে যথাযথ মাত্রা রাখিতে না পারিলেই তাহা অশ্লীল হইয়া ওঠে। আজকালকার সাহিত্যে দারিদ্র্যের কথা লইয়া ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া অযথা আস্ফালন করিবার একটা প্রবৃত্তি প্রায়ই দেখা যায়। ইহার মধ্যেও কম অশ্লীলতা নাই। দারিদ্র্যের মাঝে, জগতের বঞ্চিত দুর্গতদের কাহিনীর মাঝে অনেক সত্য, অনেক ব্যথা উদঘাটন করিয়া দেখাইবার আছে। সে কথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু যথার্থ শ্রদ্ধা লইয়া আন্তরিক ভাবে সে চেষ্টা করা এক কথা আর পালোয়ানের মত করুণ রসের কাদায় প্যাঁচ কষিয়া গড়াগড়ি দেওয়া অন্য কথা। এই প্রভেদের কথা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াই রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁহার কোন এক প্রবন্ধে এমনই ধরণের একটা কথা লিখিয়াছিলেন, ‘কোন অকিঞ্চনের ঘরে হয়ত এত অভাব যে আমানি খাবার মত একটা মাটির পাত্রও নেই। মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে সে ক্ষুধার সময় আমানি খায়। সংসারে এর চেয়ে শোকাবহ করুণতম দরিদ্র দশার চিহ্নও বোধ করি আর নাই। কিন্তু এ

নিয়ে কবিতা লেখা চলে না। দারিদ্র্যের এত বড় সার্টিফিকেট সত্ত্বেও। পক্ষান্তরে কোন একদিন ঠিক গোধূলি বেলায়, পূজার অর্ঘ্য বহিয়া রাধিকা মন্দিরের পথে চলেছিলেন, সেইটুকু দৃশ্য আশ্রয় করে বৈষ্ণব কবির গীতিকবিতার উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।'

সমী হাসিয়া কহিল, এর থেকে কি প্রমাণ হয়?

দীপ্তি—কি প্রমাণ হয় জানিনে, কিন্তু এইটুকু অসংশয়ে বুঝিতে পারি, রাধিকার গোধূলি-বেলার সেই গমন-দৃশ্যের মাঝে ছিল ঐশ্বর্য্য, ছিল পরিপূর্ণতা। তাই সে চিরন্তন কালের সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

সমী—তবে কি তুমি বলিতে চাও ঐশ্বর্য্যের কথা ছাড়া সাহিত্য হইতে পারে না? কিন্তু তোমার ধারণা যে ভুল, সমাজের তলানি অত্যন্ত নিম্নস্তরের দুর্গতদের কাহিনী লইয়াও যে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে এ কথার প্রমাণরূপে নানাদেশের সাহিত্য হইতে আমি তোমাকে রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। দীপ্তি হাসিল, থাক, আর দৃষ্টান্তে কাজ নাই। সে সব দৃষ্টান্তের কথা আমিও জানি। কিন্তু ঐশ্বর্য্য কথাটার আমি অমন অর্থ করি নাই। তোমাকে তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত অন্তর্দৃষ্টি এবং আবেগ লইয়া দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্যের কথা যেখানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেখানে তাহা সাহিত্যিক ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু যেখানে লেখক এই সাহিত্যিক পরিপূর্ণতা, এই সাহিত্যিক ঐশ্বর্য্য আনিতে পারেন নাই, আনিয়াছেন কেবল দারিদ্র্যের উৎকট আস্ফালন এবং মত্ত দাপাদাপি, রসভঙ্গ হইয়াছে শুধু সেইখানেই।

তোমাকে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, তাহা হইলেই আমার কথাটা পরিষ্কার হইবে। কোন একজন আধুনিক লেখকের অনেক উপন্যাসে দেখিয়াছি, তাহাতে সর্ব্বহারা, উদাসী, বিরাগী প্রকৃতির ছন্নছাড়া একজন যুবক থাকিবেই। তাহার ঘরের সবই এলোমেলো। বিছানার চাদরটা নিশ্চয় দুইমাস ধোপার বাড়ীর মুখ দেখে নাই। ছেঁড়া বালিশের তুলা বাহির হইয়া চারিদিকে উড়িতেছে। ঘরের সর্ব্বত্র একটা বদ্ধ ভাপ্‌সা গন্ধ। একটা কি যেন আছে, কি যেন নাই গোছের ভাব। এই ঘরখানা নিঃসন্দেহই কোন আত্মীয়ের একতলার অব্যবহার্য্য স্যাঁতসেতে একখানা ঘর। কালক্রমে সেই অপ্রয়োজনীয় নোঙ্‌ড়া ঘরখানায় একটুখানি মাথা গুঁজিয়া থাকিবার অধিকারও সেই যুবকের আর রহিল না। সে তখন তৃতীয় শ্রেণীর এক মেসে উঠিয়া গেল। যে ঘরে চার পাঁচ খানা তক্তপোষের পাশে আর একখানা ছোট অপরিসর খাট সে অধিকার করিয়া বসিল। সে ঘরের অপরাপর বাসিন্দাদের মাঝেও দারিদ্র্যের চিহ্ন উত্তরোত্তর ফলাও করিয়া আঁকিবার চেষ্টার কোনই অভাব নাই। সেখানকার কেহ বা তাহারই মত সর্ব্বস্বহারা, শীর্ণ চেহারা, মাথার চুলগুলা উস্কো খুস্কো—কেবল দুই চোখের দৃষ্টি হইতে অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ বাহির হইয়া ভারতবর্ষের ভাবী প্রতিভাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। কেহবা পঁচিশ টাকার কেরাণী। এখন সেই যুবকের আত্মীয়-গৃহবাস কালের এক পূর্ব্বতন তরুণী বান্ধবী তাঁহার সহিত এই মেসে আসিয়াছেন দেখা করিতে। ম্যাট্রিক পাশ, স্বাধীন চিন্তাশীলা।

সিঁড়িতে টক্ টক্ করিয়া উঠিয়া আসিতে আসিতেই মাঝ পথে বন্ধুর সহিত দেখা।

'এ কী! কোথায় চলেছ? এ যে পুরুষের মেস! আমার ঘরখানা, তাও আবার সীঙ্গল্ সীটেড্ নয়। চল চল। যদি আমার সঙ্গে প্রয়োজন ছিল দেখা করবার, কোন পার্কে গেলেই স্বচ্ছন্দে চলতো।'

'না ছাড়ো, দীপ্দা। ওসব বাজে convention আমি মানিনে। যদি দেখা কর্‌তে হয় এখানেই করব।'

হতাশ ভাবে তাহার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ চোখের দিকে চাহিয়া যুবক কহিল, 'আচ্ছা তবে চলো।' আপিসের সময় হইয়াছিল। কেরাণী বাবুটি তখন তাঁহার ময়লা কাছাটি গুঁজিয়া অফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তরুণীকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া কহিলেন, 'একখানা চেয়ার আনিয়ে দোব?'

'না চেয়ারের দরকার নেই। আমি ওসব convention মানিনে। আমার যা বলবার রয়েচে আমি দাঁড়িয়েই স্বচ্ছন্দে ব'লতে পারব।'

শুনিতে শুনিতে সমীর মুখ লাল হইয়া উঠিতেছিল। সে কহিল, থাক, আর বলিবার প্রয়োজন নাই। সেই বইখানা আমি কালরাত্রিতে তোমার টেবিলের উপর দেখিয়া পড়িয়াছি।

দীপ্তি—তবে তো ভালোই। দেখিয়াছ যে সেই বইয়ের সর্ব্বত্র দারিদ্র্যের আস্ফালন প্রকাশ করিতে গিয়া লেখক সেখানাকে কী ভাল্গার, কী অশ্লীল করিয়া ফেলিয়াছেন। তাই আমি তোমাকে একটু পূর্ব্বে বলিতেছিলাম, কেবলমাত্র প্রণয়-সংক্রান্ত

ব্যাপারে মাত্রা রাখিতে না পারিলেই যে কাব্যে এবং সাহিত্যে অশ্লীলতা আসে তাহাই নয়, যে কোন প্রসঙ্গ মাত্রই অসংযত আস্ফালনে লিখিলে তাহা হইয়া পড়ে বিধিমত অশ্লীল। বস্তুতঃ এখনই যে উপন্যাসের কয়েকটা পাতার সারমর্ম্ম তোমাকে বলিতেছিলাম সেই স্থানটার চেয়ে বেশী অশ্লীল আমার কাছে শকুন্তলার এবং দুষ্মন্তের কুঞ্জবন অন্তরালের অনেক সঙ্গোপন কথোপকথনও মনে হয় নাই।

জানিনা এতক্ষণ অবধি বকিয়া সাহিত্যের পরিপূর্ণতার সম্বন্ধে আমার মনে যে একটী নিভৃত আদর্শ আছে তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিলাম কি না। অবশেষে আর একটা মাত্র কথা বলিয়াই চুপ করি। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাসে দিবাকর এবং কিরণময়ী যেখানে গৃহত্যাগ করিয়া বর্ম্মা যাইতেছে, সেখানে জাহাজের উপর কিরণময়ী ও দিবাকরের অনেক দৃশ্য, অনেক কথোপকথন খণ্ড খণ্ড (দৃশ্যের মত) করিয়া দেখিলে রীতিমত অশ্লীল, ভাল্‌গার লাগে। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসের লক্ষ্য, আদর্শ ও সৌন্দর্য্যবোধের সহিত মিলাইয়া লইলে অসংশয়ে বইখানা আমি আমার মেয়েকে পড়িতে দিতে পারি। তাই তোমাকে বলিতে সাধ যায়, সাহিত্যের বিচার করিতে বসিলে তাহাকে দরদ দিয়া, হৃদয় দিয়া সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিও। কাটা ছেঁড়া করিয়া তাহাকে বিশ্লেষণ করিতে বসিলেই যে সকল সময়ে তাহার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন হয় এমন নহে।

[সাহিত্যে পরিপূর্ণতা

[তিন]

শ্রীমতী দীপ্তি নানা প্রসঙ্গ লইয়া আমাকে মাঝে মাঝে বকাইয়া মারেন। সেদিনও তাঁহার কী খেয়াল হইয়াছিল, সহসা রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতাখানি খুলিয়া পড়িতে সুরু করিলেন। তা পড়ুন ক্ষতি নাই। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতা কে না পড়িয়া থাকিতে পারে, তাহা তো জানি না এবং যখন তিনি সায়াহ্নের স্তিমিত প্রশান্ত আলোকে তাঁহার ললিত কণ্ঠ-স্বরে সুমধুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"সংসার মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব!

সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে!

প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে'
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
শিশিরের মত রবে!

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর ;

কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা
কিছুই মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু'চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর !

তখন আমার যদিচ অতিশয় ভালো লাগিতেছিল কিন্তু এইটুকু পড়িয়া তিনি পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, দেখ, আজকালকার সাহিত্যে বাস্তবতার (রিয়ালিজ্‌ম্) যে ধূয়া উঠিয়াছে সে প্রসঙ্গের যাহা কিছু বাদ-প্রতিবাদ এবং তর্কের উত্তাপ, সে কি এই ক'টি লাইনের মধ্যে হারাইয়া যাইবে না ?

প্রশ্ন শুনিয়া আমি বিচলিত হইয়া কহিলাম, স্ত্রীলোকের যুক্তির ধরণই এরূপ। তর্কের উত্তর তর্ক করিয়া দেয়। কবিতার মাঝে সত্যকে ডুবাইবার আকাঙ্ক্ষা কেন ?

দীপ্তি কহিল, না গো না, এইরূপই হয়। তর্কের ধূলায় এবং বাক্যের ঝড়ে যখন দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন হইবার জো হয়— সত্যের দিশা মেলে না, তখন এমনই কোন অসীম সৌন্দর্য্যময় বাণীর মধ্যে অকস্মাৎ সত্যের প্রতিবিম্ব চোখে পড়ে।

সমী কহিল, তুমি যে তর্ক-শাস্ত্রের মাথায় পা দিয়া ডুবাইতে বসিয়াছ। কিন্তু যা বলিতেছ একরূপ বুঝিয়াছি। তুমি বলিতে চাও, সাহিত্যের কাজ জীবনের উপর একটা আলো ফেলা। সংসারে আনন্দকে আরও নিবিড় এবং বেদনাকে আরও অনির্ব্বচনীয় করিতেই কবির কাব্য।

দীপ্তি—আমি কি বলিতে চাই আর কি চাহি না, সে কথা না-ই বা শুনিলে। কিন্তু কবির মানস-লোকের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের এই কয়েকটি লাইনে যেরূপ ফুটিয়াছে তাহার তুলনা আছে কি? তাই আমি ভাবিতেছিলাম সাহিত্যে 'রিয়ালিজ্‌ম' বলিয়া আজকাল যে একটা ধুয়া উঠিয়াছে তাহার আসল অর্থ টা কি?

সমী—তাহার অর্থ এই যে, যাঁহারা রিয়ালিষ্টিক্ লেখক তাঁহারা বলিতেছেন, আমরা অযথা ভাব-বিলাসে এবং কল্পনার মায়া-জালে সত্যকে অস্পষ্ট করিয়া দেখাইব না। সংসারে যাহা ঘটে, যাহা একান্ত সাধারণ, সহজ, স্বাভাবিক আমরা তাহাই প্রকাশ করিয়া দেখাইব। যদি তাহাতে উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের মহান্ সৌন্দর্য্য না-ও থাকে, ক্ষতি নাই। মানুষকে দেবতা করিয়া দেখাইবার মিথ্যা মোহ আমাদের নাই। তাহার দৈন্য, দুর্ব্বলতা, কুশ্রীতা, অসম্পূর্ণতা—এ সমস্তই আমরা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইব। জগতের যে তমিস্র পথ বাহিয়া বঞ্চনা, অত্যাচার এবং দুর্গতদের নিত্য চিত্তক্ষোভ মথিত হইয়া উঠিতেছে, সে পথের কাহিনীও আমরা রচনা করিব।

এ করিতে চাওয়া কি খুব অসঙ্গত?···খুব অন্যায়? এমন একদিন ছিল, যখন মহাকাব্য রচনা করিবার জন্য মহাকবিদের রামের মত আদর্শ চরিত্রের সন্ধান করিয়া ফিরিতে হইত। কিন্তু আজ যদি কোন কবির এমনতরো সাহস হইয়া থাকে যে, তিনি বলিতে পারেন—নরোত্তমকে খুঁজিয়া ফিরিতে আমি ত্রিভুবন চষিয়া বেড়াইব না। হাতের কাছের লোক, ঘরের পাশের লোক, যাহাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারা কোন মহান্ আদর্শে অভিনিষিক্ত নয়, চিন্তা যাহাদের সঙ্কীর্ণ, আদর্শ ব্যাহত এবং জীবন বর্ণহীন—তাহাদেরই জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা কাব্য-সৃষ্টি করিব। সংসারে যাহারা নিজের মধ্যেই আবদ্ধ, প্রকাশহীন, জ্যোতির্হীন তাহাদের উপর কল্পনার দিব্য দৃষ্টি ফেলিয়া জগতের সেই সব মূক হৃদয়কে বাঙ্ময় করিব। কেন, জগতের যিনি সব চেয়ে বড় কবি, যিনি কল্পনা এবং সৌন্দর্য্যের রসে এমন নিবিড়, যাঁহার কথা স্মরণ করিয়া পল্ রিশার বলিয়াছিলেন, "হাঁ, কবি বটে। যেন রূপদেব, যেন গন্ধর্ব্ব", তিনিও তো এই বস্তুই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন—

"যদি এক মুহূর্ত্তের তরে দুঃখ পায় তার ভাষা
সুপ্তি হ'তে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর তিয়াষা
তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।"

দীপ্তি—কিন্তু আজকালকার রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্যে এই সুর, এই গভীর আকাঙ্ক্ষা কি সর্ব্বত্রই ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে? এ

সাহিত্য পড়িয়া মাঝে মাঝে কি মনে হয় না যে, ইহা অস্বাভাবিক, ইহা কেবল গায়ের জোরে কোন কিছুকে অহরহ 'চ্যালেঞ্জ' করিবার একটা প্রবৃত্তি। এ যেন সমস্ত সংস্কার এবং সংযমের সীমান্ত নীতিকে বিদীর্ণপ্রায় করিবার একটা অত্যুগ্র ঝোঁক।

অবশ্য আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়াও কোনদিন কোন ভালো সাহিত্য রচিত হয় নাই। বস্তুতঃ যিনি সৃষ্টি করেন তাঁহার পুরাতনের প্রতি নির্ম্মমতা স্বাভাবিক। কিন্তু যে বস্তুটির অভাব তীব্রভাবে বোধ করি, সে তাঁহাদের সংযমহীনতা, সে তাঁহাদের সৃষ্টি-শক্তির অভাব।

সমী—তাহার মানে ?

দীপ্তি—তাহার মানে তাঁহারা থামিতে জানেন না এবং চাহেন না।

সমী—তাহা নয়, নব-সাহিত্যের বাস্তব-বাদ বলে যে, আমরা সংযমের এবং সৌন্দর্য্যের আবরণ টানিব কেন ? সংসার যেখানে তাহার ধূলিঘর্ঘর চক্রপথে অবিরাম চলিয়া গিয়াছে, থামিতে চায় নাই, সেখানে অমরাও থামিব না। যাহা দেখাইবার, শেষ অবধি দেখাইব এবং যাহা বলিবার শেষ পর্য্যন্ত বলিব। কুচ্-পরোয়া নাই। সে বস্তু সাহিত্য হইয়া উঠুক কিংবা নাই উঠুক তাহা খাঁটি সত্য, তাহাতে রসের ভেজাল নাই।

দীপ্তি—কিন্তু কাব্যের এবং সাহিত্যের যে সংজ্ঞাটা মুখে মুখে বিখ্যাত সেটা এই যে, 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্'।

আজকালকার রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্য কেবল ঐ রসাত্মকম্-এর বদলে সত্যাত্মকম্ কথাটা ব্যবহার করিতেছে। রসের চেয়ে সত্যের উপর জোর দেওয়া হইতেছে বেশী। অথচ আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সাহিত্যের সহিত সত্য কথাটাকে এত করিয়া মিশাইবার প্রয়োজন কোন্‌খানে? যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সংসারে ঘটে, তাহাই লইয়া কি সাহিত্য রচিত হইতে পারে?

সমী—আমারও তাই মনে হয়। অবশ্য সৃষ্টির পিছনে সত্য অভিজ্ঞতা এবং সত্যকার অনুভূতি থাকা চাই-ই। কিন্তু যে সমস্ত দিন-যামিনীর ইতিহাস আমি জানি, যে শত শত অভিজ্ঞতার ইতিহাস আমাদের আছে, তাহাকে ঠিক কোন্‌খানে আরম্ভ করিলে, কোথায় শেষ করিলে, কেমন করিয়া সংলগ্ন করিতে পারিলে, কত কথা পরিহার এবং কত বস্তু বানাইয়া যোগ করিলে তবে এই বস্তুপুঞ্জ হইতে, এই অভিজ্ঞতা-পিণ্ড হইতে পুষ্পের মত একটি সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিবে—সেইটাই তো আসল রহস্য। তখন যাহা ছিল আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাহাই হইয়া উঠিবে সকলের সামগ্রী, আমার আত্ম-প্রকাশের মাঝে অনেকে আপনার প্রকাশ খুঁজিয়া পাইবে। এখানেই তো আর্টের সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা ওষ্ঠে তর্জ্জনি রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। তাই আমার মনে হয়, রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্যের এই যে গর্জ্জন—অপ্রিয় হইলেও আমরা সত্য বলি, হৌক রসভঙ্গ, হৌক অসহ্য, স্থূল, তথাপি আমাদের একমাত্র কৈফিয়ৎ যে,

আমরা সত্য বলি—এ আস্ফালনের অনেকখানিই ফলাইয়া তোলা। কারণ ব্যবহারিক জগতের সত্য হইতে সাহিত্যিক সত্যের অনেক প্রভেদ আছে।

দীপ্তি—আশ্চর্য্য !···এমন কথাও বলিলে ! আমরা তো জানি যাহা সত্য তাহা চিরদিনের এবং চিরকালের। সাহিত্যের সত্য যে দুনিয়া ছাড়া একটা অদ্ভুত বস্তু, এমন মনে করি না।

সমী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল—না না, আমি ঠিক তাহা বলি নাই। কিন্তু সাহিত্যিকের একটা বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে সেই দৃষ্টির মধ্য দিয়া যেটুকু তিনি ছাঁকিয়া লইবেন তাহা অবিমিশ্র fact নয়। এই কথাটাই কেবল আমি বলিতে চাই।

এ প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। পূজনীয় শরৎচন্দ্রের লেখার একান্ত আন্তরিকতা স্মরণ করিয়া অনেকে নাকি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আপনার চরিত্রগুলি কি সত্য ঘটনা হইতে সংগ্রহ করা? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'সত্যের সঙ্গে কল্পনা এবং কতখানি বুকের রক্ত মিশাইয়া তাহারা তৈয়ারী, সে কথা আর কেহ না জানুক আমি তো জানি!' তাঁহার মুখের এই কথাটাই পরম শ্রদ্ধাভরে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি। যাঁহারা প্রকৃত শিল্পী তাঁহারা গুটিকতক চরিত্র-সৃষ্টির ভিতর দিয়া দেশকাল অতীত কোন মহত্তর ব্যঞ্জনাকে যখন প্রকাশ করিতে চাহেন, যখন কথার রেখাপাতে কত নর-নারীর জীবন-রহস্য, সুখ-দুঃখ, বেদনা সজীব হইয়া

আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতে থাকে, তখন তাঁহারা কেবল সত্যের উপর বরাত দিয়া বসিয়া থাকেন না। চোখে যাহা দেখিয়াছি কেবল সেইটুকুই এবং ততটুকুই প্রকাশ করিব, এমন কোন কঠিন পণ আগেভাগে তাঁহারা করেন না। বরঞ্চ তাঁহারা বলেন, সত্যকে সত্যসত্যই শুধু প্রকাশ করা নয়—প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে হইবে বলিয়াই যাহা দেখি, তাহার সহিত আরো অনেক-কিছু যোগ বিয়োগ করিতে হইবে।

'কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্ম্ম-শপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব—(পঞ্চ-ভূত)।'

দীপ্তি—কিন্তু আমরা বর্ত্তমান সাহিত্যে বাস্তবতার (রিয়ালিজ্‌ম্) আতিশয্য—যাহা লইয়া কথাটা সুরু করিয়াছিলাম, ক্রমশঃ তাহা হইতে সরিয়া আসিতেছি।

সমী—না, সরিয়া আসি নাই। একটা কথা সুরু করিলে তাহাকে অনেক দিক্ দিয়া দেখিতে হয়। আমি এতক্ষণ ধরিয়া বলিতে চাহিতেছিলাম, রিয়ালিজ্‌ম্ মানে যদি জীবনের ফটো তোলা হয়, হুবহু যাহা দেখিব তাহাই বলা এবং সব কথাকেই শেষ পর্য্যন্ত বলা, তাহা হইলে বলিতেই হইবে, রিয়ালিজমের মাঝে কোথাও একটা বড় রকম ভ্রান্তি আছেই।

দীপ্তি—আচ্ছা এ-সম্পর্কে আর একটা কথা তোমাকে প্রশ্ন করি। মানুষের হৃদয়-সম্বন্ধে এতদিন যাঁহারা কল্পনা-বিলাস করিয়া তাহার উচ্চদিকটাই দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা এক দিকের

পরিচয় কি অসম্পূর্ণ রাখেন নাই ?……মানুষের চেতন এবং অবচেতন মনে অন্ধকার, পাপ এবং বীভৎসতায় যে অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেটাকেও খুলিয়া দেখানো কি সাহিত্যেরই কর্ত্তব্য নয় ?

সমী—…এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে সাহস হয় না। কিন্তু মানুষের সমস্ত বিকার, বিরোধ ও দৈন্যকে ছাপাইয়াও সে যে মানুষ, এই পরিচয়টা যেন সাহিত্যের কোন কোঠাতেই চাপা পড়িয়া না যায়। তোমার এ প্রশ্ন শুনিয়া আমার শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' বহির গুটিদুই লাইন মনে পড়িয়া গেল। কিরণময়ী বলিতেছে, 'কবি যে শুধু সৃষ্টি করে, তা নয়, কবি সৃষ্টি রক্ষাও করে। যা স্বভাবতঃই সুন্দর, তাকে যেমন আরও সুন্দর ক'রে প্রকাশ করা তার একটা কাজ, যা সুন্দর নয়, তাকেও অসুন্দরের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা তারই আর একটা কাজ।'

(দিবাকর) 'তা'হলে কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না ?'

'ঠিক জানি নে। হতেও পারে। শুনি, মন্দের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঘৃণা জাগিয়ে দেওয়া নাকি কবির কাজ। কিন্তু ভালোর উপর অত্যন্ত লোভ জাগিয়ে দেওয়া কি তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ নয় ?'—

এখন না হয় অপরিসীম সাহিত্যিক মূল্যের কথা বাদ রাখিয়া 'শেষের কবিতা'র সঙ্গে কোন এক রিয়ালিষ্টিক্ উপন্যাসের তুলনা করিয়া দেখ। 'শেষের কবিতা' সত্য কি মিথ্যা জানি না, সমস্ত বাংলাদেশে এক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অমিত কিংবা লাবণ্যের

ভাষায় আর কেহ কথা বলে কি-না, তাহাও জানি না, কিন্তু 'শেষের কবিতা' পড়িবার পর বিশ্বের কোন এক সঙ্গোপন প্রান্ত দিয়া প্রেমের যে অভাবনীয়, অনির্ব্বচনীয় রূপ বহিয়া যাইতেছে, সূর্য্যোদয়ের রাগে আকাশের অনাহত প্রশান্তির মত যাহা চল-চঞ্চল, ক্ষণিক সুদুর্লভ তাহাকেই কবির মায়ামন্ত্রবলে চোখের উপর এমন দেদীপ্যমান, এত সুস্পষ্ট, এত স্থায়ীরূপে দেখিতে পাইয়া সৌন্দর্য্যের প্রতি গভীর তৃষ্ণায় আমাদের সমস্ত মন কিরূপ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠে। তখনই তো মনে হয়, ভালোর উপর অত্যন্ত লোভ জাগাইয়া দেওয়া, সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল করা, সকল কালের সকল কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যকারের সব চেয়ে বড় কাজ।

দীপ্তি কহিল—আরও একটা কথা আছে, সাহিত্যের মাঝে আমরা তো কেবল কোন বস্তুর যথাযথ বর্ণনা পাই না, তাহার মাঝে পাই ব্যঞ্জনা। দরিদ্রের কথা লইয়া, সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনা লইয়া যে গল্প, তাহাতে যদি কেবল পাইতাম দৈনন্দিন দারিদ্র্যের খুঁটিনাটি বর্ণনা বা সাধারণ মানুষের একটানা ক্লান্তিকর জীবনের পুনরাবৃত্তি, তবে তাহা কি কাজে লাগিত? যাহারা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, বাহির হইতে দেখিলে যাহাদের অনুজ্জ্বল নিরানন্দ জীবনে একটা একাকার ধূসরতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, তাহাদেরও যে কত মুহূর্ত্তে হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তড়িৎশিখার মত কত আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনার বিদ্যুৎপ্রবাহ ঝলসিয়া যায়, নিঃশব্দ

আবরণের তলায় অবরুদ্ধ কত আবেগ (যাহার নিশানা তাহারা নিজেরাই হয়তো ভালো করিয়া জানে না, অস্তিত্ব যাহার তাঁহাদের আপনার কাছেই অনেক সময় অজ্ঞাত) মথিত হইয়া উঠে, সে-সকল খবর আমরা সাহিত্য-কারের কাছেই তো পাইব। যাঁহার দৃষ্টি বেশী তিনিই অন্তর্দৃষ্টি-বলে আমাদের চোখের সুমুখে এই সকল অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবেন। তাহা না হইলে কেবল দারিদ্র্যের ঘনঘটা বর্ণনা লইয়া যে সাহিত্য, তাহাকেই রিয়ালিষ্টিক্ লেবেল মারিয়া বাহবা দিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

সমী কহিল,—কিন্তু—

দীপ্তি—কিন্তুর চেয়ে আমি তোমাকে আমার কোন কোন প্রিয় লেখকের লেখা হইতে কোন কোন গল্পাংশের কথা একটু-আধটু বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিব যে, দারিদ্র্যের এবং সাধারণ জীবনের তুচ্ছতার আবরণ জীর্ণ করিয়া মানবাত্মার স্পর্শ দিতে চাওয়া এক জিনিব আর অযথা দারিদ্র্যের স্ফীতকায় কলেবর-খানা নাড়াচাড়া করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে চাওয়া অন্য বস্তু। John Christopher-এর 'The House' অধ্যায়খানা পড়িয়া দেখিও। তাহাতে অনেক দরিদ্র. অনেক দুঃখ-অভিহত, অনেক আশাহতের কাহিনী আছে। কিন্তু তাহাদের অন্তরাত্মা এই দৈন্যের, এই তুচ্ছ দিন-যাপনের মাঝেও যে কী গান গাহিয়া চলিয়াছে, সে কথা তাহারা জানে না। তাহারা জীবনস্রোতে আবক্ষ মগ্ন। কিন্তু যে শিল্পী, যে বিচ্ছিন্ন, যে অসংসক্ত, তাহারই স্বচ্ছ দৃষ্টির তলায় তাহা ধরা পড়িয়াছে, "But only

Christopher could perceive and hear the silent music of their souls; they heard it not: they were all absorbed in their sorrow and their dreams."

সমী কহিল—রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্যের অর্থাৎ আমাদের দেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে রিয়ালিষ্টিক্ সাহিত্য-নামে যে বস্তু চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে আরও একটা কথা আমার বলিবার রহিয়াছে। একদা আমি আমার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম, * * * লেখকের লেখার আমার সমস্তই ভালো লাগে এবং তিনি যে শক্তিমান সে কথাও অস্বীকার করি না, কেবল তাঁহার লেখার 'ভাল্গারিটি' আমার সহ্য হয় না। রিয়ালিষ্টিক্ কথাটা বিশেষণ হিসাবে যতই দাগিয়া দিবার চেষ্টা করি, এ বিতৃষ্ণা কিছুতেই যায় না।

দীপ্তি হাসিয়া কহিল—তোমার সেই বন্ধু প্রত্যুত্তরে যাহা লেখেন তাহা আমি জানি। তিনি সেক্সপীয়র এবং কালিদাস হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিয়া লেখেন—'ইঁহাদের ভাল্গারিটির তুলনায় * * * ইনি তো শিশু। আপনি তবে সেক্সপীয়র, কালিদাসের লেখা পড়িয়া এত আনন্দ পান কিরূপে?' কিন্তু তুমি তাহার উত্তর কি দিয়েছিলে?

সমী—আমি বলিয়াছিলাম, শিশুই তো। সেই জন্যই যে 'ভাল্গার' লাগে। আমার একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয় দীপ্তি, সত্যিকার রিয়ালিষ্টিক্ লেখক হওয়া অত্যন্ত শক্ত কাজ। তাহাতে অনেক শক্তির আবশ্যক করে। সংসারে যাহা স্বভাবতঃই সুন্দর, যাহা মহান্, তাহাদের কথা চিত্রিত করিয়া হৃদয়-মনকে আর্দ্র

করা সহজ। কিন্তু অজ্ঞাততম কোণ হইতে সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করা এবং অখ্যাত, অনাদৃত, প্রাত্যহিক জীবনের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া তাহাদের উপস্থাপিত করা নিরতিশয় কঠিন। শাজাহানের তাজমহল কিংবা সুন্দরী শুকতারা লইয়া কবিতা লিখিতে যতটা শক্তি চাই, তাহার চেয়েও পূর্ণতম শক্তির বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়িনী' কবিতা, দেহের সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে এমনতরো লাইন লিখিয়াও—

"অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু পরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায়—"

কিংবা 'চিত্রাঙ্গদায়'—

"ফুল্ল মালতীর লতা টুপ্ টাপ্ করি
মোর গৌর তনু পরে পাঠাইতেছিল
শত নিঃশব্দ চুম্বন; ফুলগুলি কেহ
চুলে, কেহ পদমূলে, কেহ স্তনতটে
বিছাইল আপনার মরণ শয়ন!—"

কিংবা 'মানস সুন্দরী'র—

"পরশে পরশে দোঁহে করি বিনিময়
মরিব মধুর মোহে। দেহের দুয়ারে?"

কিংবা 'বিবসনার' মত কবিতা লিখিয়াও যিনি সৌন্দর্য্যের স্বচ্ছ ধারা এবং অকলঙ্ক মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন তাঁহাকেই—

বাধা দিয়া দীপ্তি কহিল—কিন্তু তুমি আসল প্রসঙ্গ হইতে ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতেছ······

সমী—না দূরে যাই নাই। আমি শক্তির কথা বলিতেছিলাম। শক্তিমান না হইয়া শক্ত জিনিষে হাত দিলেই বাধে গোলমাল। কালিদাস এবং সেক্সপিয়র যে সব বিষয়ের অবতারণা করিয়াও ভাল্‌গারিটির হাত হইতে সৃষ্টিকে রক্ষা করিয়া তাহাকে অনবদ্য করিয়াছেন, অল্প শক্তির হাতে পড়িয়া তাহাদেরই স্থূলতার আর অন্ত নাই। একজন লেখক আমাকে লিখিয়াছিলেন, "যৌন-সম্পর্কের বিষয়ে কোন কথা বলিতে গেলেই কিংবা যৌন-মিলনের কোন ছবি আঁকিলেই লোকে হা হা করিয়া ওঠে! লোকে বলিতে থাকে, এ কেন? এ তো আমরা জানি। এ তো নিত্যই ঘটিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তরে আমার বলিতে ইচ্ছা করে, আমরা যে খাই, সে কথাটাও যে নিত্য নিয়মিত। তবুও তো সাহিত্যে ভোজনের বর্ণনা অচল নয়। অথচ খাওয়া জিনিষটা কত নিম্ন স্তরের, মানুষের গভীর···গভীরতম অন্তর্জগতকে তাহা কত অল্পই না স্পর্শ করে। পক্ষান্তরে যৌন-সম্পর্ক মানুষের জীবনের কতখানি অধিকার করিয়া আছে, তাহার মনোজগতের কত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম প্রদেশে প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে, এ বস্তু আঁকিব না কেন?"

দীপ্তি কহিল—ছি ছি, এমন কথা তিনি বলিলেন কি করিয়া? প্রকাশ করিতে জানিলে সব জিনিষকেই সাহিত্যে

স্থান দেওয়া যায়। খাওয়ার কথা···কিন্তু সেই যে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এ তারকেশ্বরে কেবল একবেলা রমা, রমেশকে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল বলিয়া রমেশ বসিয়া বসিয়া নিজের জীবনটাকে আগাগোড়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিস্ময়ের পার পাইল না; কেমন করিয়া এক বেলার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যরসে তাহার সমস্ত জীবনের ধারাটা বদলাইয়া গেল। সে কি শুধু ভোজনের বর্ণনা! এ আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, অভুক্ত নরেনকে সেদিন পরিতোষ করিয়া নিজে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইতে না পারিলে বিজয়া যে কষ্ট পাইত, সেদিন নরেনের খাওয়ার সামনে পাখা হাতে বসিবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যে লজ্জা এবং আনন্দের ঝড় উঠিয়াছিল, এ সমস্তই সে যদি মনের মাঝে এত নিবিড় করিয়া অনুভব না করিত, তবে তাহা আর্টের পর্য্যায়ে উঠিত কি করিয়া? খাওয়া জিনিষটা স্থূল হইতে পারে, কিন্তু ইহাকেই আশ্রয় করিয়া একজনের জন্য আর একজনের যে ব্যাকুলতার অন্ত নাই, এ অনুভব এমন করিয়া আমরা প্রকাশ হইতে দেখিয়াছি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যে, আর তো ইহাকে স্থূল বলিয়া ঠেলিয়া রাখিবার উপায় নাই।

সমী আবিষ্ট হইয়া আপন মনে কহিল—আমিও হলফ্ করিয়া বলিতে পারি 'দত্তা'য় সেই যে বিজয়া সুমুখে বসিয়া নরেনকে খাওয়াইয়া এক বেলায় যত আনন্দ পাইয়াছিল তাহার সহিত এক বছর ধরিয়া পরমাণুবাদ এবং চিত্রকলার নিহিত তত্ত্ব লইয়া ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল্ তর্ক করিলেও তাহা পাইত কি-না সন্দেহ।

আর ঐ যে 'শ্রীকান্ত'—তৃতীয় পর্ব্বের একটি লাইন রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ্য করিয়া 'কেবল মনে হইতে লাগিল যেন চিরদিনের মত এই নারীর জীবন হইতে আমি মুছিয়া বিলুপ্ত হইতে পারি এবং আজ, শুধু একটা দিনের জন্যও সে যেন আমার খাওয়ার স্বল্পতা লইয়া আর আলোচনা করিবার অবসর না পায়'—এইটুকুর মধ্যে যে কত ব্যথা, কত অভিমান' কত বড় বিতৃষ্ণা লুকাইয়া আছে···

দীপ্তি—তুমি একটা কথা লইয়া যখন বকিতে আরম্ভ কর, বড্ড বাড়াও। কিছুতেই থামিতে চাও না।

সমী—না, না, বাড়াইবার কথা নয়। আমি বলিতেছিলাম, বলিতে জানিলে খাওয়া এবং খাওয়ানো লইয়াও করা যায় সাহিত্য-সৃষ্টি এবং যৌন-প্রবৃত্তিকেও আনা যায়। কিন্তু কেমন করিলে এই সব বস্তুকেও আর্টের পর্য্যায়ে উঠান যায়—সে রহস্যের খবর আমি জানি না। সাদা চোখে কেবল এইটুকু দেখিতে পাই, একের রচনায় যাহা হইয়া উঠিয়াছে একটি সুনির্ম্মল প্রস্ফুটিত ফুল, অপরের লেখায় তাহারই ভাল্‌গারিটি এবং কুশ্রীতার পরিসীমা নাই।

দীপ্তি—কিন্তু সে প্রভেদের হিসাবটা সাদা চোখে দেখিতে না পাও, একটু প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। বহুদিন আগে রোঁমা রলাঁর 'অ্যানেৎ এণ্ড সিল্‌ভি' নামে একখানা বহি পড়িয়াছিলাম, তাহার শেষের অধ্যায়ে একটা দৃশ্য ছিল; নায়িকা অ্যানেৎ বন-বীথিকার পথে তাহার প্রণয়ীর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে অকস্মাৎ তাহাকে এক রকম জোর করিয়াই অরণ্যের

পথে তাহাদের বহু পুরাতন পল্লীভবনে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার পরে যাহা আছে তাহা যে এত বড়, এত সুন্দর করিয়া বলা যায়, সে কথা রলাঁর লেখা না পড়িলে হয়ত জানা যাইত না। এই আমি তোমাকে বলিতেছি, যে গভীর তৃষ্ণা, যে পরম সত্যের পটভূমিকা পিছনে রহিয়াছে বলিয়া আমাদের সমস্ত চিত্ত ঐ বহির সেই অধ্যায়খানি পড়িয়াও বিস্ময়ে এবং গভীরতায় ভরিয়া ওঠা ছাড়া আর কোন ভাবই মনে আনিতে পারিল না, সেই সত্যের সাক্ষাৎ কয়জনে পাইয়াছে···তেমন সাধনা ক'জনের আছে। তাই তো মনে হয়, তপস্যা নাই অথচ স্পর্দ্ধা আছে, তাহাতে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। তাই যখন অনেক আধুনিকতম রিয়ালিষ্টিক্ লেখকের লেখা পড়ি, তখন মনে হয়, সেই সকল বিকৃত, ক্লিষ্ট সাহিত্য হইতে একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উঠিতেছে; "হে মোহিনী বহ্নিরূপিণি! যদি সোনা হইতাম তো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম— কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবি, তাই ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

সমী—বোধ হয় তাই। তা না হইলে অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে কণ্ব-আশ্রমে কবিবর কালিদাস যাহার অবতারণা করিয়াছিলেন তাহার পিছনে সত্যের অতবড় জোর না থাকিলে সে বস্তুকে স্থূলতা এবং ভাল্‌গারিটির হাত হইতে কেহই তো রক্ষা করিতে পারিত না! কিন্তু শকুন্তলার শেষে কালিদাস এমনতরো শ্লোক রচনা করিতে পারিয়াছিলেন—

"বসনে পরিধূসরে বসানানিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈক বেণিঃ
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥"

এবং রবীন্দ্রনাথ অবশেষে 'চিত্রাঙ্গদা'য় এমন জিনিষ দিয়াছিলেন—

> "প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত
> সুগঠিত নবনী-কোমল সৌন্দর্য্যের
> যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি
> করিয়াছ পান! আর কিছু বাকী আছে?
> আর কিছু চাও? আমার যা কিছু ছিল
> সব হ'য়ে গেছে শেষ?— হয় নাই প্রভু!
> ভালো হোক্, মন্দ হোক্, আর কিছু বাকী
> আছে, সে আজিকে দিব।"

সেই জন্যই দেহ-সম্ভোগের যত কিছু বর্ণনা ম্লান হইয়া কুসুমের মত ঝরিয়া গেছে, তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রশান্ত, আভাময়, চিরদিনের, চিরকালের সৌন্দর্য্য-রূপ!

এই জন্যই আমার সেই বন্ধুর চিঠির উত্তরে লিখিয়াছিলাম— 'সেক্সপীয়র এবং কালিদাসের তুলনায় ভাল্‌গারিটিতে আজ-কালকার অনেক রিয়ালিষ্টিক্ লেখক শিশু! হাঁ, শিশুই তো, কিন্তু এ অর্থের অপর দিকটাও যেন দেখিতে ভুলিও না।'

[সাহিত্যে রিয়ালিজ্‌ম্‌

[চার]

গুটি তিন চার মাসিকপত্রে একই সাহিত্য বিষয়ক প্রসঙ্গ পড়িয়া সমী কহিল, দেখিতেছি আজকাল সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্য কী, এবং সাহিত্যের রীতিনীতিই বা কী প্রকার সেই সম্বন্ধে লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়াছে বেশী। দীপ্তি কহিল, কৌতূহলটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিতে পারি না। বাংলা সাহিত্যের প্রসার এবং পরিধি দিন দিন এত বাড়িয়া চলিতেছে যে, সাহিত্য সম্বন্ধে নানা মতামত নানা যাচাই করা কথা এবং বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যের আলোচনাটাকে পাব্লিকে জুড়াইয়া দিতে চাহে না।

সমী গম্ভীর হইয়া কহিল, দেবী! তোমার কথার সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। বাংলা সাহিত্যের প্রসার বলিতেছ তুমি কাহাকে? আমি ত দেখি বাংলা সাহিত্যে আর সব জিনিষই আছে, নাই কেবল প্রসার। তাহার প্রকাশ-ভঙ্গী বিংশ-শতাব্দীর নব নব সাহিত্যিকের হাতে পড়িয়া নূতন ভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; ষ্টাইল বল, সাজসজ্জা বল, পরিপাটি করিয়া গুছাইয়া দু'কথা বলার অসাধারণ ভঙ্গী বল, সমস্তই তাহার আসরে অপর্য্যাপ্ত। যে বস্তুর অভাব তাহা প্রসারের অভাব, তাহা বৈচিত্রের অভাব। আমার মনে হয় যে কোন একটা বাংলা মাসিক খুলিলেই যে চোখে পড়ে, "আর্ট্ ফর আর্ট সেক" অথবা আর্টাৎ—পরতরং নহি" এই গোছের প্রবন্ধ তাহার একটা কারণ এই যে, আমাদের দেশে আর্টের ক্ষেত্র দূরদিগন্ত

অবাধ বিস্তৃত নয়। সীমাবদ্ধ জলাশয়ে অত্যল্প ব্যবহারেই একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়।

দীপ্তি কহিল, ভাবিয়া দেখিলাম, সত্যই তাই। সেইজন্যই শরৎচন্দ্রের মত সাহিত্যকারের পুঁজিও সঙ্কীর্ণ। তাহা বারংবার একই ধুয়াতে ফিরিয়া আসে। তাঁহার সাহিত্যেও সর্ব্বত্র একই বস্তুর বারংবার পুনরাবর্ত্তন ঘটে।

সমী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল, তাই নাকি? বলি একথাটা তোমার কবে হইতে মনে হইয়াছে?…মনে পড়ে, এই কথাটাই কিছুকাল পূর্ব্বে তোমাকে একবার বলিতে গিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলাম।

দীপ্তি কহিল, আমার মনে হওয়ায় কিছু আসে যায় না কিন্তু ভাবিয়া দেখ তাঁহার সাহিত্যের, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকের সাহিত্যেরও কী নিদারুণ একটানা ক্লান্তিকর সুর! ধর পথ নির্দ্দেশের গোটাকতক পাতায় তিনি যা বলিয়াছেন: গুণীর প্রতি হেমের প্রবল আকর্ষণ, তাহাদের মিলিবার পথে সামাজিক অন্তরায়, হেমের সেই দুই লক্ষবার করিয়া মন্ত্র জপ করা, সেই কাশীর গুরুদেবের মূর্ত্তিখানি, সেই মন্ত্র-তন্ত্র, জপ তপ, আচার বিচারের শতলক্ষ বেড়াপাকে নিজকে অহর্নিশ দূরে সরাইয়া লইবার প্রাণান্তিক চেষ্টা এবং তাহার পরে সেই নিরর্থক আত্মনিগ্রহের অবসাদে আপনার বিরাট ফাঁকি বুঝিতে পারা।—পথনির্দ্দেশে তিনি ওইটুকু পরিসরের মধ্যে যাহা আর্টিস্টিক ভঙ্গীতে এমন সংহত, এমন সুন্দর করিয়া বলিয়াছিলেন

যে তাহার মধ্যে কোথায়ও অসম্পূর্ণতা ছিল না। তাহা আবার বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবুও সেইটুকু বস্তুকে লইয়াই তাঁহাকে শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্ব হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত টানা হেঁচড়া করিতে হইয়াছে। ইহারই বা কারণ কি?

সমী কহিল, কারণ যে কী তাহা তুমি জান। যদিচ একটা খুব সুন্দর কথা আছে 'Imagination is eternity' তথাপি কেবল কল্পনা দিয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না এটা ভয়ানক পুরাতন কথা। কল্পনার সঙ্গে জীবনের সত্যকার অভিজ্ঞতা আসিয়া না মিলিলে দেহে প্রাণসঞ্চার হয় না। এখন জীবনের অভিজ্ঞতা বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের বাঁচিবার পরিসর কতটুকু? আমাদের সমাজ জীবনের কত অল্পের মধ্যে পরিসমাপ্তি?...এ কথাটা দু'দণ্ড ভাবিলেই ত চোখে পড়ে।

তাইত শরৎচন্দ্রের আজকালকার লেখা সম্বন্ধে লোকে যখন বলে, তিনি বহু পুরাতন একই কথা লইয়া কেন এমন করিয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন?...তাঁহার মত সৃষ্টিকারের হাত হইতে আমরা কি নব নব বস্তুর প্রত্যাশা করিতে পারি না? তখন সকলের সহিত গলা মিলাইয়া একযোগে প্রতিবাদ করা অপেক্ষা আমার মনে হয়, এমনই যে হয়! শরৎচন্দ্রের যত বড় প্রতিভাই থাকুক তিনি বাংলাদেশের সত্যিকার শিল্পী, তাইত যে কথা আজও বাংলা দেশের কথা হইয়া উঠে নাই, যে সমস্যা আজও বাংলা দেশের স্নায়ু-শিরায় সঞ্চারিত হইল না সেকথা তাঁহার হাতে ফুটিবে কেন?

দীপ্তি কহিল, তুমি যে দেখি বড় ভয়ানক কথা বল ! শিল্পী কি দেশকালের অন্তর্ব্বর্ত্তী ? আর যদি বা তা-ই হয় বাংলা দেশের সমস্যা আজকাল কি ক্রমশঃ অসীম হইয়া উঠিতেছে না ? বিপ্লববাদের সমস্যা, পরাধীনতার সমস্যা হরিজন সমস্যা……সমী হাসিয়া ফেলিল। কহিল, পূজার সময় "হরিজন শাড়ি" অবধি উঠিয়া গিয়াছে। কাগজে কাগজে দেখিতেছি তাহার বিজ্ঞাপন। অথচ হরিজন সমস্যা এখন বাংলা সাহিত্যের ভিতর ঢুকল না। এ কেমন কথা !

দীপ্তি রাগ করিয়া বলিল, গম্ভীর আলোচনার মাঝেও তামাসা করিয়া তোমার দুটো কথা বলাই চাই ! সত্য করিয়া বল না বাংলা দেশে আজ সমস্যার অভাব কোনখানটায় ?

সমী (গম্ভীরভাবে)—না, তা নাই বটে।

দীপ্তি—তবে ?

সমী—তবে আমার কী মনে হয় জান ? বহুদিনের বহু শতাব্দীর রেখাপাতে করুণ, বহুজনের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষায় স্নিগ্ধ, সজল, পুরাতন, যে সকল সমস্যা তাহারাই জাতির যথার্থ হৃদয়ের ধন। ইংরেজীতে ট্র্যাডিশন বলিয়া একটা কথা আছে। বাংলাতে সংস্কার বলিলে উহার কিছু অর্থও প্রকাশ হয় না। কিন্তু সুমুখের দিকে চাহিয়া দেখ, গঙ্গার ধারের বহু পুরাতন ওই বৃদ্ধ বটগাছটার তলায় একটি পাথর আছে, খুব ছোট বেলাতেও দেখিয়াছি তাহা ঠিক অমনি ভাবেই রাখা ছিল। ওই প্রস্তর খণ্ডটিকে আশ্রয় করিয়া নববর্ষার কত শ্যামল

তৃণ ওখানে অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হইয়াছে। গ্রীষ্মদিনের রৌদ্রে আবার তাতিয়া পুড়িয়া তাহারা ঝলসাইয়া গেছে। ভরা বর্ষায় গঙ্গার জল স্রোত-প্লাবনের বেগে কতবার আসিয়া উহাকে স্পর্শ করিয়া গেছে। মোটের উপর সবই জড়াইয়া ওই পাথর খণ্ড-টুকুর সহিত এই গঙ্গাতীরের অনেক ট্র্যাডিশন জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ওখানা লইয়া আমার একটা কবিতা লিখিতে ইচ্ছা করে। পক্ষান্তরে নতুন আনিয়া রাখা—শীলদের বড়বাবুর গঙ্গা-তীর হইতে সূর্য্যাস্ত দেখিবার জন্য—ওই পাথরের জলচৌকিটা দেখিয়া কবিতা দূর হৌক, কোন একটা কোমল ভাবও মনে আসে না! আমার মনে হয়, আসল সাহিত্যও জাতির ট্র্যাডি-শনের উপর নির্ভর করে। যে জাতির ট্র্যাডিশন নাই সে জাতির সাহিত্যও নাই। নব্য আমেরিকার ধন, জন, বিজ্ঞানের অন্ত নাই এবং সে দেশে সমস্যারও বোধ করি অভাব নাই, কিন্তু অত্যন্ত নূতন দেশে এখনও সে ট্র্যাডিশন সৃষ্ট হইয়া ওঠে নাই কালক্রমে য়ুরোপের যাহা হইয়াছে। বহু মানবের বহু যুগযুগান্তের আনন্দ, বেদনা স্খলন, বিদ্রোহ, শান্তি, সকল জড়াইয়া যে একটি, অখণ্ড, চিরন্তন সুর, যে একটি পরিপূর্ণতার গান —কবির ভাষায় যাহাকে বলিতে ইচ্ছা করে "কোন মেঘের সে মায়া!" ট্র্যাডিশনের সেই মায়াটুকু চোখে অঞ্জনের মত করিয়া না পরিতে পারিলে কবির লেখায় অমৃতছন্দ উৎসারিত হইয়া ওঠে না।

দীপ্তি অধৈর্য্য হইয়া কহিল, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে তোমার এসকল বক্তৃতা শোনাইবার অর্থ?

সমী কহিল, আহা ব্যস্ত হও কেন, আমি তাই বলিতে-ছিলাম; খদ্দরের সমস্যা, হরিজন সমস্যা, এনার্কিজমের সমস্যা এখনও বাহিরের বস্তুই হইয়া আছে। জাতির সুখ দুঃখ এবং উত্থান পতনের পথ ধরিয়া সমগ্র জীবনধারার সহিত এক হইয়া মিশিয়া তাহারা এখন ট্র্যাডিশনের রসে সিক্ত হইয়া ওঠে নাই।

দীপ্তি বলিল, বক্তৃতার মত করিয়া কথা বলা থামাও, সহজ ভাষায় সোজা করিয়া বল।

সমী—আচ্ছা তাই বলিতেছি। সাহিত্য জীবনের এবং সমাজের প্রতিরূপ, একথাটা লোকের মুখে মুখে অবিরত উচ্চারিত হইয়া জরাজীর্ণ হইয়া আসিয়াছে বটে তবু ইহা যে সত্য তাহা মান ত?

দীপ্তি কহিল, তা মানি।

সমী—তবে শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসখানা একবার মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখনা, তাহা হইলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তাহার ওই উপন্যাসে বিপ্লবী সব্যসাচী আমাদের মনের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়াছে? সে কত সামান্য! মনের পনেরো আনা অংশই কি অপূর্ব্ব-ভারতীর সুমধুর স্নেহরসে ভরিয়া ওঠে না?...অথচ বই-খানি বিপ্লববাদের কাহিনী, সব্যসাচীই তাহার প্রধান নায়ক। এবং মূলতঃ বিপ্লবের কথা আছে বলিয়াই তাহা সেন্সরশিপের করকমলেষু হইয়াছে। ইহা হইতে তোমার কী মনে হয়?

দীপ্তি কহিল, কী মনে হয় জানি না, কিন্তু তাই ত! 'পথের দাবীতে' সব্যসাচীর কথা কতটুকু মনে পড়ে? ...বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে, অপূর্ব্ব আর ভারতীর ছোট ছোট টুকরো টুকরো অনির্ব্বচনীয় মধুর সব কথা। যে মুহূর্ত্তে "ভারতীর দেওয়া কাপড়ে ভগবানের পূজা অবধি করিতে অপূর্ব্বর বিতৃষ্ণাবোধ হইয়াছিল," তাহার ঠিক পর মুহূর্ত্তে হোটেলে রাত্রিবাস করিতে হইবে শুনিতে পাইয়া সে ভারতীর বিছানা চাদর এবং বালিশ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। "আপনার এতুটো জিনিষ কিন্তু আমার চাই-ই। অন্যের বিছানায় শুতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়।" একথা যখন পড়িলাম—তখন কোথায় রহিল সব্যসাচীর অসাধ্য সাধনের প্রয়াস, ভারতের দূরপরাহত স্বাধীনতার ছবিই বা কোথায় মিলাইয়া গেল! শুধু চোখের সুমুখে নিরন্তর ভাসিতে লাগিল ভারতীর হৃদয়দানের ঐশ্বর্য্য, তাহাদের দুইজনের প্রেম সম্পর্কের মাধুর্য্য সমস্ত মনকে মুগ্ধ, অভিভূত, আবিষ্ট করিয়া রাখিল। তুমিই বল এমন হয় কেন?

সমী চৌকির উপর বসিয়া কহিল, আমার মনে হয় এইরূপ হইবার কারণ বাংলাদেশ গার্হস্থ্যের দেশ। এদেশে বৈষ্ণবপদাবলী সম্ভব, এদেশে শত্রুর ভয়ে বাংলার শেষ রাজার খিড়কি পথে পলায়ন সম্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র রাজার স্বেচ্ছাচারিতার দমন করিতে প্রজাদের হাতে রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণ বধ হওয়া সম্ভব নয়। এ বস্তু তাহারা কল্পনা করিতেও পারে না। তাহারা বিলাসী, প্রমত্ত রাজাকে মুখোমুখি রাজসভাতে দেখিতে না

পাইলে কেবল সৌধ বাতায়নের অলিন্দে ঝুলান তাঁহার চরণ ছ'খানি দর্শন করিয়াই লুটাপুটি খাইতে থাকে।

দীপ্তি হাসিয়া কহিল, এতও জান! স্বজাতির এমন নিন্দা কোথায় পড়িলে? হাঁ, মনে পড়িয়াছে বটে, প্রাচীন ভারতের এই আদর্শ রাজভক্তির হাস্যস্পদতা চতুর কালিদাসের নিকট এড়াই নাই। কিন্তু তুমি যে দেখিতেছি এক নিশ্বাসে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস এবং মহাকবি কালিদাসের কথা উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে! ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায়?

সমী কহিল—আমি কেবল তোমাকে এইটুকু বুঝাইতে চাহিতেছি, কোন একটা সমস্যাকে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থ-নৈতিক—যে কোন অতি প্রয়োজনের তাগিদেও বাহির হইতে ঢুকাইয়া দিয়া তাহাই লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সেইজন্যই বাংলা দেশের যাহা জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রেম, স্নিগ্ধতা, আবেগ-প্রবণতা এই সকল দিকেই তাহার সাহিত্যের রূপ খুলিয়াছে। অন্যদিকে খোলে নাই। বোধকরি এইজন্যই বাংলা সাহিত্যের প্রসারও বাড়িতেছে না। প্রেমের পর্য্যায়েই ক্ষণে ক্ষণে তাহার দশা-পাওয়ার মত স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা প্রভৃতি দশম দশা প্রকাশ হইতেছে।

দীপ্তি কহিল—যদি তা-ই হয়, তবে এই কামনা করি যে, জাতির মনোবৃত্তির প্রসার দিন দিন বাড়ুক। তাহা বৈষ্ণব পদাবলী এবং প্রেমের প্রচ্ছায় ঘন সীমান্তে সুচিরকাল আপনাকে

নিবদ্ধ না করিয়া রাখিয়া পৃথিবীর নব নব সমস্যাকে আপন জীবন রসে জীর্ণ করিয়া লউক। সে সমস্ত সমস্যাই জাতির সত্যিকার ট্র্যাডিশন হইয়া উঠুক।

সমী—কিন্তু সে যতদিন না হইয়া উঠিবে ততদিন বাহির হইতে চেঁচাইয়া লাভ নাই যে, বাংলা সাহিত্যে শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্বের মত চার খণ্ডের উপন্যাসই সম্ভব হইল কিন্তু সম্ভব হইল না রোঁলার 'জন-ক্রিষ্টফার', গলস্‌ওয়ার্দ্দির 'ফরসাইথ সাগা' বা টলষ্টয়ের 'রিসারেক-সনের' মত সুবৃহৎ কয়েক খণ্ডের উপন্যাস, যে উপন্যাসে কেবল মাত্র প্রেমের পরিণতি দেখান ছাড়াও একটা বৃহৎ জাতির এক যুগের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং শতলক্ষ অভীপ্সার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে।

দীপ্তি কহিল—তোমার মত তা-ই! আচ্ছা এইবারে ওই কথাটার মানে কি বলত, ওই যে, 'আর্ট ফর আর্টস সেক'—কথাটা লইয়া আজকাল সর্ব্বত্র বাড়াবাড়ি হইতেছে। কেহ বলিতেছে, জীবন আর্টকে নিয়ন্ত্রিত করে। কেহ বা বলিতেছে, ওটা একটা চালবাজীর কথা। সস্তা কথা। এ্যানিমিক সৌন্দর্য্য বিলাসীদের কথা। জীবন হইতেই আর্টের উদ্ভব। সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে "Life comes out of life."

সমী হাসিয়া কহিল, এই দুই দলের তর্কের জের আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা সেই অতি পুরাতন তর্ক। পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র? এ জিজ্ঞাসারও শেষ হইল না। এবং এই জিজ্ঞাসা উপলক্ষ্য করিয়া পাণ্ডিত্য বিস্তারেরও পরিধি কমিল না।

দীপ্তি—কিন্তু তোমার মতটা কি? শুনিয়া রাখি, হয়ত পরে কাজে লাগিবে!

সমী—কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখি, আর্য্যা, আমার পাণ্ডিত্যের 'পরে লেশমাত্র ভরসা রাখিবেন না। আমি শুধু মনের ভাবটা সহজ ভাবে বলিতে চেষ্টা করিতেছি। আমার মনে হয়, আজকাল একদল লোক যে বলেন, জীবনের মত সাহিত্যকে একান্ত প্রকৃত এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে হইবে। এবং Life comes out of life-এর আদর্শে যাহারা বিশ্বাসবান, যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত' লিখিয়াছেন, সে বিশ্বাস ভুল। 'অপরাজিত' একটি আন্তরিক, স্বাভাবিক বই হইয়াছে কিন্তু আর্ট হইয়া উঠে নাই। জীবন হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি কিন্তু সেই জীবনেরই কোনখানে কতটুকু প্রকাশ করিতে হইবে, যাহা এলোমেলো ছন্ন ছাড়া হইয়া আছে, যাহার মধ্যে আছে অসংখ্য পুনরাবৃত্তি তাহাকেই ঠিক কেমন করিয়া গুছাইয়া কোনদিক হইতে দেখাইতে পারিলে মানুষের হৃদয়ে তাহা স্পর্শ করিবে সেইটুকু বাছিয়া লওয়াই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সকলের চেয়ে বড় ক্ষমতা। প্রকৃতির সহিত কবির সম্বন্ধ যে কী, তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'অধ্যাপক' গল্পটিতে একস্থানে যেমন করিয়া লিখিয়াছেন বুঝিবা তাহার তুলনা নাই—

"আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও সুন্দর—সে আমাকে অহরহ মূকভাবে অনুনয় করিতেছে, আমি মৌন, তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অন্তঃকরণে যে একটি অব্যক্ত স্তব উত্থিত

হইতেছে তুমি তাহাকে ছন্দে, লয়ে, তানে তোমার সুন্দর মানব ভাষায় ধ্বনিত করিয়া তোল!—"

কবির কাছে, শিল্পীর কাছে, সাহিত্যিকের কাছে, জীবনের দাবী এবং প্রকৃতির দাবী ইহাই। প্রকৃতি বলে, কবি, আমাকে যাহা দেখিতেছ, হুবহু যদি তাহারই তুমি প্রতিকৃতি আঁকিবে তবে তুমি কবি কেন? আমার পত্র-পল্লবের চিকণ রঙ আঁকিয়াই তুমি খালাস পাইবে কেন? তাহার মর্ম্মর ধ্বনিতে যে ঔদাসীন্য, যে অব্যক্ত ব্যাকুলতা সেও যে তোমাকে কাণ পাতিয়া শুনিতে হইবে।

জীবনে যাহা এলোমেলো তোমাকে যে সাজি ভরিয়া তাহাকেই গাঁথিয়া তুলিতে হইবে! তাই যদি না হইবে তবে সাহিত্যিকের প্রয়োজন কী? কিসের জন্য এত বেদনা অন্তরে বদ্ধ করিয়া চোখে এমন স্বপ্নের জ্বালা লইয়া তুমি চির জীবন কথার মালা গাঁথিতে চাহিলে? একথার দাম ত তাই। জীবনের পরম রহস্য, উৎসারিত বিস্ময়, গভীর সুখ, গভীরতম দুঃখ সকলের ত চোখে পড়ে না। তাহারা ছড়াইয়া আছে, তাহারা কে কোথায় পড়িয়া আছে ঠিকানা নাই। সাধারণ মানুষের পক্ষে সাধারণ জীবদের মাঝেও এই সকল অমূল্য বস্তুকে আবিষ্কার করিবার শক্তি নাই। তাহাদের সে ক্ষমতা সে অবসর সে ধৈর্য্য কিছুই নাই। তাইত কবির কাছে প্রকৃতি দেবীর এত মিনতি· আমি মৌন, আমাকে ভাষা দাও। আমি বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত, তুমি আমাকে এক ও সংহত করিয়া এমন করিয়া প্রকাশ কর

যাহাতে আমাকে দেখিবামাত্র লোকের চোখে লাগে, মনে ধরে, অন্তঃকরণে গ্রথিত হইয়া যায়।

দীপ্তি কহিল, বেশ, তাহা হইলে বল, কবির কাজ এমন করিয়া প্রকাশ করা যাহাতে জিনিষটা ফুলের মত ফুটিয়া উঠে। যাহা ছিল স্থানভ্রষ্ট মাল-মশলার মত ইতস্ততঃ ছড়ান, লুকান তাহাদেরই একত্রিত করিয়া এমন একটি অনবদ্য রূপ দেওয়া যে একনিমিষে তাহা লোকের মনোহরণ করে। তাহা হইলে রূপকারের রূপটাই আসল, এবং বস্তুর চেয়ে প্রকাশের ভঙ্গীটাই শ্রেষ্ঠ!

সমী হাসিয়া কহিল, তর্কের মুখে তুমি আমাকে যেদিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছ তাহা লইয়া ইতিমধ্যে এত গবেষণা এত আলোচনা, এত তুমুল বাদপ্রতিবাদ হইয়া গেছে যে, জিনিষটা জরাজীর্ণ হইয়া পড়িল। ষ্টাইল বড় না প্লট বড়? আপেলের ছবি এবং প্রেয়সীর ছবি শক্তিমানের হাতে আঁকা হইলে একই বস্তুতে দাঁড়ায় কিনা? ন্যেপকিন এবং কোলে করিবার মত একটি ছোট খাট কুকুরের বিষয়ে কোন কবিতা যথোচিত নৈপুণ্যের সহিত লেখা হইলে তাহা তাজমহলের বিষয়ে তেমনি সমান নৈপুণ্যের লেখা কবিতার সমান হয় কি না? এ সকল কথা এতবার এতরকম করিয়া আলোচনা হইয়াছে যে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবুও বিষয় বস্তুর একাকারত্ব লইয়া যতই বাড়াবাড়ি হইতে থাকে আমি বলিব, পথ প্রান্তের উপেক্ষিত কুচি ফুল লইয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে পারেন বটে এবং

তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব শক্তি বলে সে কবিতা সাহিত্যের কোঠাতেও স্থান পায়, কিন্তু মৃতা, অর্দ্ধবিস্মৃতা প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া তাহার সারা মন যখন উদ্বেলিত হইয়া ওঠে তখন কুর্চ্চি ফুল আমল পায় না। তখন স্মরণ করিতে হয় মাধবীকে। তখন কবির লেখনী বিষয় বস্তুর অসাম্য মানিয়া লইয়া লেখে :

"তোমার চিকণ
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্ম্মর-মুখর ছায়া মাধবী বনের
হ'ত স্বপনের।"

আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমিও বিশ্বাস করি আর্টের জীবনমূলের ভিত্তি···আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সংসারের আঙ্গিনাতেই। কিন্তু এইটাই ত আর সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র কথা নয়। বিজ্ঞান বলে, কয়লায় এবং হীরকে একই উপাদান। অথচ একই প্রাণের উৎস একই উপাদান হইতে জন্ম লইয়াও হীরার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। সাহিত্যও তাই। সাহিত্য তাহার স্রষ্টার শক্তিতে, সৌন্দর্য্যে, গরিমায় মাধুর্য্যে এই জগৎ হইতে উদ্ভূত হইয়াও একটা স্বতন্ত্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। রোঁলার কথায় আমারও মনে সাড়া দেয়। তিনি যখন বলেন আর্টকে, "Thou art beyond the world. Thou art a whole world to thyself."

জীবনের হুবহু প্রতিরূপ আঁকা কখনই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তাই-ই যদি হয় তবে সাহিত্যের প্রয়োজনই বা কী? তাহা ছাড়া প্রত্যেক যুগের মর্ম্মকথা, প্রত্যেক যুগের সভ্যতা, আশা, আদর্শ, স্বপ্ন তাহারা সত্যিকার প্রতিভাকে অহোরাত্রি অনুনয় করিতেছে, তুমি আমাদের প্রকাশ কর। তুমি আমাদের সংহত করিয়া, চোখ পড়িবার মত করিয়া পরবর্ত্তী কালের লোকের চোখে পড়িবার জন্য প্রস্তুত করিয়া নাও। সে কাজ সফল হইবে কেমন করিয়া যদি শিল্পী মানিয়া লন যে জীবনের হুবহু নকল করিয়া যাওয়াই তাঁহার কাজ? রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূতে একস্থানে স্রোতস্বিনী কহিতেছে, "এমন করিয়া আমি কখনো কথা কহি না এবং কহিতে পারি না। তুমি আমাকে যতখানি দেখ আমি ত ততখানি নহি।"

তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমি তোমাকে বেশী বলাইয়াছি তাহা ঠিক নহে—আমি বরং তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি। তোমার লক্ষ লক্ষ কথা, লক্ষ লক্ষ কাজ, চির বিচিত্র আকার ইঙ্গিতের কেবলমাত্র সার সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি। নইলে তুমি যে কথাটি আমার কাছে বলিয়াছ ঠিক সেই কথাটি আর কাহারো কর্ণগোচর করাইতে পারিতাম না। লোকে ঢের কম শুনিত এবং ভুল শুনিত।"

আমার মনে হয়, স্রোতস্বিনীর এই বিবৃতি এবং উত্তরের মধ্যেই সাহিত্য সমস্যার একটা বড়দিক প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। লোকে যখন বলে, অমুক লেখক অতিরিক্ত আইডিয়ালিজ্‌ম্

ঘেঁষিয়া গেছে। কিম্বা যখন বলিয়া বসে, অমিত রায়, সুচরিতা, ললিতা বা উর্ম্মিমালার মত করিয়া কথা বলিতে বাস্তব জীবনে কাহাকে দেখিয়াছি? এই কি সত্যিকার জীবনের প্রতিকৃতি?—তখন বলিতে হয় সত্যিকার জীবনে প্রবেশ করিতে হইলে, তুচ্ছতার সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া নিরালোকে, স্তব্ধ সুমহান একক আত্মার সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতে গেলে যতখানি অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা তোমার আমার আছে কি?

স্রোতস্বিনীর নম্র সংশয়ের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছিলেন, "আমার কি এত স্নেহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক যতখানি—আমি তোমাকে ততখানি দেখিতে পাইব? একটি মানুষের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে, ঈশ্বরের মত কাহার স্নেহ!"

তেমনি আমারও প্রশ্ন করিবার কামনা হয় বড় বড় প্রতিভাবানের সাহিত্য রচনায় কোনখানে আইডিয়ালিজমের মাত্রা চড়িয়াছে তাহার বিচার করা কি এতই সোজা? একটি মানুষের সমস্ত ইয়ত্তা করিতে গেলে ঈশ্বরের মত অসীম স্নেহের প্রয়োজন হয়, তবে এ যুগের অন্তর্নিহিত বাণী, এক সভ্যতার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে গেলে কত বেদনা, কত স্নেহ, কতখানি দরদ এবং অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক হয় তাহারই বা ইয়ত্তা করে কে?

সাহিত্যিকের কাজই এই বাছাই করা, নির্ব্বাচন করা, গুছাইয়া লওয়া এবং প্রতিভার পরিচয়ই এইখানে। শিল্পী বোঝেন যে জীবনের নকল করিলে তাঁর চলিবে না। তাঁহাকে জীবনের

লক্ষ লক্ষ প্রবাহ হইতে বাছিয়া লইতে হইবে, তাঁহাকে অনেক কিছু বাড়াইতে এবং কমাইতে হইবে, তাহা না হইলে তিনি নিজে যে নিজের জন্য মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহাকে জগতের সম্মুখে বাহির করিতে পারিবেন না। করিতে গেলে লোকে ঢের কম দেখিবে এবং ভুল দেখিবে।

দীপ্তি চিন্তাবিষ্টভাবে কহিল, তোমার কথাটা আমি এক রকম করিয়া বুঝিয়াছি। তাই সেদিন মোঁ পা সা র একটি গল্পে পড়িতেছিলাম—তিনি বলিতেছেন : সমস্ত রকম আর্টের মধ্যে স্থাপত্য-কলার আসন এত উচ্চে কেবল এইজন্য যে, "Throughout the ages, it has had the privilege of symbolizing, so to speak, each epoch ; to represent by means of a very small number of typical monuments, the manner of thinking, feeling and dreaming of a race and a civilization" এবং শুধু স্থাপত্য-কলা কেন—যে কোন শ্রেষ্ঠ আর্টের আসল উদ্দেশ্য তা-ই। যে বস্তুর উপর এত বড় গুরুভার দায়িত্ব রহিয়াছে তাহাকে কি বলা সাজে যে আমি বাস্তব-জীবনের হুবহু প্রতিলিপি করিয়াই একটা জাতির, একটা যুগের, একটা সভ্যতার, একটা সমাজের আত্মাকে প্রকাশ করিয়া যাইব!

[সাহিত্যের আলোচনা

[পাঁচ]

বারান্দায় আরাম-চৌকির উপর সমী চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

অন্ধকার আকাশ; প্রথম শুক্লপক্ষের একটুখানি জ্যোৎস্নার আভাস এই দিকটায় তখনও আসিয়া পড়ে নাই।

দীপ্তি বাতির আলো হাতে করিয়া পাশের দরজা দিয়া বারান্দায় আসিল।

সমী অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে পাশের ত্রিপায়ার উপর বাদামী-রঙের একটা কাগজের মোড়কের দিকে চাহিয়া কহিল, ভেবেছিলাম আরও কিছুক্ষণ যদি তোমার দেখা না পাই, তখন—হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে নতুন বহির পাতা ওল্টাতেও বাধবে না।

দীপ্তি কহিল, আমি তোমার ল্যাম্পের আলোকে এখান থেকে নির্ব্বাসন দিয়ে একেবারে বাইরে পাঠিয়েচি, যেখানে চৌকি এবং সোফার অরণ্যে তোমাকেও আবিষ্কার করে নিতে হয় এবং কাঁচের দেরাজে মরক্কোবাঁধান বইগুলোর সোনার জলের নাম সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে।

সমী কহিল, বেশ ত আজকের রাত্রিতে ওসব থাক্। তোমার বাতির স্নিগ্ধ আলোয় মনের মত কিছু পড়।

দীপ্তি কহিল, আমি আজ বাণভট্টের কাদম্বরী পড়ব—যার ভিতর ব্যস্ততা নেই, কোন আইডিয়া অথবা চিন্তাকে প্রকাশ করবার অত্যুগ্র ঝোঁক নেই; আজকের নির্জ্জন রাত্রি এবং অখণ্ড অবকাশের সঙ্গে মিল রয়েচে।

সমী কহিল, দেখ, বাণভট্টের কাদম্বরীর ভিতর একটি চিত্র আমার ভারি ভালো লেগেচে। রাজকুমার চন্দ্রপীড়ের সঙ্গে বন্দিনী পত্রলেখার যে সম্বন্ধটুকু গড়ে উঠেচে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের ঠিক এইরকম বন্ধুত্ব হয় কি না জানতে কৌতূহল হয়।

দীপ্তি কহিল, পত্রলেখার মত চন্দ্রপীড়ের আহারে বিহারে, বিশ্রামে শয়নে, সর্ব্ববিধ অবস্থায় কেবলই সঙ্গে এবং সখ্যের অজস্র আদান থাকবে; স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরকে জানবে, বুঝবে, আইডিয়ার আদান প্রদান করবে, অথচ সেখানে সমস্ত রকম বোঝার অতীত, কোন আবেগের লেশ এসে পড়বে না, যেখানে দেওয়া ছিল স্পষ্ট করে সীমানা—কোন অতর্কিত ক্ষণে সে যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না, একথা পণ করে বলা কঠিন।

সমী কহিল, এই জন্য আধুনিক য়ুরোপে স্ত্রী এবং পুরুষের মাঝে companionship বলে যে একটা অভিনব এবং ব্যাপক সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়ে উঠেচে, তার ভিতরকার অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা দেখে আমাদের শাস্ত্রে সেই জাতীয় সম্বন্ধকে উৎপাতের দ্রব্য বলে গণ্য করা হয়েচে। তাই গোড়া ঘেঁসে এইটেকে অস্বীকার করবার জন্যে শাস্ত্রে বিধান দিয়েচে—স্ত্রীলোকে "পূজার্হাগৃহদীপ্তয়ঃ", কিন্তু তাঁরা যে পুরুষদের হৃদয়কেও দীপ্তি দিয়ে তাদের কর্ম্মশক্তিকে সক্রিয় করতে পারেন এর কোন উল্লেখ নেই।

দীপ্তি কহিল, কিন্তু এ হৃদয় দীপ্ত করার উপর আমার অধিক বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয়—স্ত্রীলোক তার আকর্ষণের এই দিকটা নিয়ে কথঞ্চিত বাড়াবাড়ি করে এসেচে।

সমী আকাশের একটা তারার দিকে চাহিয়া কহিল, প্রধানতঃ জৈবিক সৃষ্টিতে স্ত্রীলোকের অংশ এবং মানসলোকের সৃষ্টিতে পুরুষের প্রধান ভূমিকা। সভ্যতার প্রথম যুগে যখন মানসিক চর্চ্চা এবং মনোলোকের সুকুমার বৃত্তির পরিণতি অধিক পরিমাণে হয় নাই, এবং জীবসৃষ্টির প্রয়োজনই ছিল সর্ব্বব্যাপী, তখন সমাজে স্ত্রীলোকদের অধিকার অনেক পরিমাণে অব্যবহিত ছিল, কালক্রমে সভ্যতার চূড়া যখন ক্রমশঃ দিগন্ত-প্রসারিত হয়ে উঠল, তখন পুরুষদেরকে এই কাজে ডাক পড়ল, এমন কি এর আগাগোড়া তারই হাতের রচনা, এ সৃষ্টির পটভূমিকায় ক্ষণে ক্ষণে স্ত্রীলোকের দুই একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টার ছায়া পড়লেও মূলতঃ তার কোন বিশেষ অংশ এতে নেই। কিন্তু এই কথাটাকে আশ্রয় করে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে, মনোজগতের সৃষ্টিতে স্ত্রীলোকের প্রভাবমাত্র নেই, এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও কোন ক্ষতি হয়নি, তাহলে সেটা ভুল হয়, কারণ অনির্দ্দেশ্য শক্তি সঞ্চার কোন দিকেই কম নয়। মাধুর্য্যের প্রভাবকে বাইরে থেকে অস্বীকার করা যায়—কারণ প্রভাব চিরদিনই অব্যক্ত, সেটা গায়ের জোর নয় অথচ নয় বলেই যে-মন তাকে পেয়েচে সে আরও বেশী করে অনুভব করে।

দীপ্তি কহিল,—আমিও এককালে এইসব কথা এমনি করে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু জীবন-রহস্যের বৈচিত্র্য এত বেশী যে, কোন একটা সিদ্ধান্তকে জোর করে প্রমাণ করতে বসলেই তার ভিতর বিস্তর সংশয়ের ধোঁয়া বার হবে। পুরুষের সৃষ্টির

কাজে স্ত্রীলোকের মাধুর্য্যের প্রভাবকে তুমি যতই বাড়াও একে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও যে পুরুষে তার সাধনা এবং সৃষ্টিকে সমগ্ররূপে দিয়ে গেছে, ইতিহাসে সে নজীরের অভাব নেই। মিল্‌টন, নীট্‌শে, সোপেন-হাওয়ার—তাঁদের মত বড় বড় সৃষ্টি-কারের জীবনেই এর দৃষ্টান্ত রয়েচে। এমন কি আমার মনে হয় এইমাত্র তুমি যে সভ্যতার রচনা আগাগোড়াই প্রায় পুরুষের হাতের তৈরী বললে, তার সৃষ্টির দুর্গম পথে পুরুষকে একলাই চলতে হয়েচে। তার ভিতর যে সৃষ্টিকার ক্ষণে ক্ষণে উদাসী, তার নিঃসঙ্গ পথ চলায় সুচিরদিন সঙ্গী হতে পারে এমন পাথেয় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভিতর নেই, মাধুর্য্যের ভিতর নেই। তাই তাদের মিলনের মাঝে একটা জায়গায় ব্যবধানের আর অবধি নেই। সঙ্গ, স্নেহ, সখ্য এসব বাদ দিয়ে, নূতন সৃষ্টির অগ্নিবাষ্পে যেখানে পুরুষের চিত্ত সর্ব্বদা কম্পমান, সেখানে সে একাকী। এইজন্যে স্ত্রী এবং পুরুষ পাশাপাশি চলা সুরু করে বটে, কিন্তু যেখানে এই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ ঘটে, সেখানে নিঃসঙ্গের শূন্যতা পুরুষে সৃষ্টির উত্তেজনায় ভরে' তুলতে পারে, অথচ স্ত্রীলোকে পারে না।

সমী কহিল,—মানসিক সৃষ্টিতে যদিচ স্ত্রীলোকে অক্ষমতা দেখিয়েচে কিন্তু জীবনের আর একটা যে অংশে তার সর্ব্বপ্রধান সৃষ্টি অপেক্ষা করে রয়েচে, তারই বিপুল আনন্দের কথাটা তুমি বাদ দিচ্চ।

দীপ্তি কহিল,—বাদ আমি দিচ্চিনে, কিন্তু মাতৃত্বের মধ্যেই স্ত্রীলোকের সমস্ত বিফল বেদনা সার্থক হতে পারে এত

কিছুতেই ভাবতে পারিনে। আজকাল যাঁরা বিখ্যাত শরীরতত্ত্ব-বিদ্ তাঁরা ক্রমাগতই প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছেন যে, শারীরিক এবং instinctive দিক থেকে স্ত্রীলোকের মা হওয়া একটা মস্ত বড় প্রত্যাশা, জীবনের সর্ব্ববিধ ক্ষেত্র থেকে তার শক্তিকে প্রত্যাহরণ করে নিয়ে এইখানেই সে উন্মুখ করেচে, এ তার পূর্ণ হওয়া চাই; এখানে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকা,—"a profound physiological disappointment" (M. Ludovici —Woman: A Vindication) তার পক্ষে নৈরাশ্যজনক, এমন কি এই হতাশার সুরকে জীবনের অপর সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হতে দেখা যায়।

সমী কহিল, কেন তুমি কি এ-কথাটা মানতে পারচ না?

দীপ্তি হাসিয়া কহিল, যা সত্য তা চিরকালেরই, আমার মানা কিংবা না মানার উপর ত সে নির্ভর করে' নেই, কেবল আমি এই কথাটাকে যে দিক থেকে দেখচি সেইটুকুই বলব। আধুনিককালে Ludovici এবং এই ধরণের আরও গ্রন্থকারের লেখা পড়ে মনে হচ্চে, মানুষকে তাঁরা,—শরীরতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, বড় জোর স্বাস্থ্যতত্ত্ব এমনি ক'রেই বিশ্লেষণ করেচেন, কিন্তু সে যে কেবলমাত্র তত্ত্বের কোঠায় নেই, এবং তাকে ছাড়িয়ে কতদূরে কত রহস্য ছায়াময় পথে আপনাকে বিস্তার করেচে, তাকে খুঁজে পাবার এতটুকু ইঙ্গিতও নেই। তর্ক জিনিষটার শেষ নেই এবং facts এবং figures এর প্রাচুর্য্যে অনেক কথাকেই অবহিতভাবে প্রমাণ করা যায়, স্ত্রীলোকের শরীরতত্ত্ব,

মাতৃত্ব এবং অপরাপর আনুষঙ্গিক দিক্ নিয়ে যতদূর অবধি তর্ক যুক্তিবাদ ও যুক্তিখণ্ডন এবং প্রমাণের পালা রয়েচে, তাকে আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করেচি, এই সমস্ত বস্তু যে বিজ্ঞানের এলাকায় পড়ে এবং যাঁরা তারই চুল-চেরা সত্যমিথ্যার বিচারে আজীবন কাটিয়েচেন, তাঁদের-পাওয়া অসন্দিগ্ধ সত্যকে সমস্ত সংস্কার বর্জ্জন করে' গ্রহণ করতে পারাই ভালো। কিন্তু মনোলোকের আর একটা যে রহস্যান্ধকার দিক রয়েচে, সেখানে প্রমাণের চেয়ে অনুভবের আদর বেশী, সেই দিকের গুটিকতক কথাই আমি বল্‌তে চাইছি। দেখ, আমার মনে হয় পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের চরিত্রবৈচিত্র্য আরও বেশী,—জীবনের কোন একটা দিককে একান্তভাবে বিকশিত করতে যেয়ে, অপরদিকের শূন্যতা তাকে পীড়া দেয়।

সমী হাসিয়া কহিল, ভুল করচ, এ শূন্যতার বেদনা আমাদের বেলায় ঠিক এমনিই প্রবল।

দীপ্তি একটা তারার দিকে চাহিয়া কহিল, তোমরা এ বেদনা সহজেই স্বীকার করে নিয়ে সৃষ্টির তন্ময়তায় মগ্ন হ'য়ে যেতে পার, কিন্তু স্ত্রীলোক তা পারে না। তাই, পুরুষ এবং নারী মিলিত জীবন সুরু করার পর যেখানে বিচ্ছেদ ঘটে সে বিচ্ছেদ প্রতিকারহীন নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ হ'য়ে দাঁড়ায় নারীর পক্ষে, কারণ তারই পাশে পুরুষের চিত্তলোকে বেদনার উপর সৃষ্টির বৈরাগ্য সঞ্চিত হবার পথে বাধা নেই, তার আইডিয়ার জগতের সঙ্গী এবং সঙ্গিনীকে সে নিজেই সৃষ্টি করে' শূন্যতার

বোঝা লাঘব করতে পারে, অথচ একদিন যাকে সে যাত্রাপথের সঙ্গিনী বলে গ্রহণ করেছিল এতে তার নিরুপায় নিঃসঙ্গতা আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। সে বাস্তবের জীব, চারিদিকে কল্পনার আশ্রয় গড়ে তোলবার শক্তি তার কোথায়?

সমী কহিল, তুমি এমন পুরুষের কথা বললে যাঁর মধ্যে স্রষ্টা রয়েচে, কিন্তু সকলের তো তা থাকে না।

দীপ্তি কহিল, প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টা সকলের মাঝে খুঁজে পাবে না, কিন্তু কিছু পরিমাণে নির্লিপ্ত, একাকিত্ব তোমাদের চরিত্রের ভিতর রয়েচে। তোমরা জীবনকে একটা দিকে শুষ্ক রেখেও একটা দিক নিয়ে সমাহিত হয়ে থাকতে পার। শক্তি তোমাদের এতে করে আরও সংহত হয়ে সাফল্যের উপায় পায়।

সমী কহিল,—তাই যদি হয়, তোমরাও ইচ্ছে করলেই যেদিকে তোমাদের বিশেষ সৃষ্টি-ক্ষমতা রয়েচে, তেমনই কোন একটা দিক বেছে নিয়ে নিজকে পরিণত করে তুলতে পার—যদি বাস্তবক্ষেত্রে বাধার কথা বল, তার উত্তরে আমি বলব, বাইরের বাধাকে সর্ব্বব্যাপী করে আমি দেখতে পারিনে এবং বাধা ও বিঘ্নের ভিতর দিয়ে পথ করে নেওয়ার যে দুঃসাহসিকতা সে পুরুষের জীবনেও লেশ মাত্র কম নয়—এখানে তোমাদেরও এমনি করেই দায়িত্ব গ্রহণ করে মুক্তি অর্জ্জন করতে হবে। বাধা ছাড়া বিকাশ হয় না। Slumএর ভেতর থেকে কত প্রতিভা উঠেচে বাস্তবের অপরিমেয় বাধাকে জীর্ণ করে দিয়ে—নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেছে এমন শত শত দৃষ্টান্তের নজীর রয়েচে।

দীপ্তি কহিল, বাইরের বাধাকে আমিও বড় করে দেখিনে, মানুষের একবার যখন আত্মোপলব্ধি ঘটে, তখন তার ভিতরকার চেতনার কম্পন নিজের থেকেই বাইরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এতে দুঃখ যা আছে সে ত আছেই, কিন্তু সত্যিকার বাধা আমাদের বাইরের বাধা নয়, সে হচ্চে নিত্য অভ্যাসের জড়তা—মোহ, একে ত্যাগ করতে পারলেই বাইরের সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে পারা যায়। কিন্তু একথাও আমি বলচিনে, আমি বলতে চাইছি, আমরা যে কি চাই এবং যথার্থ সার্থকতা যে কোনখানে, সে-কথাটা এখন আমাদের মনে পরিষ্কার করে রূপ নেয়নি। এতকাল যেমন 'নারীত্ব' নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছিল, স্ত্রীলোকের সমস্ত বিকাশ সমস্ত উদ্দেশ্য একমাত্র ওই কথাটার ছাপে চিহ্নিত হয়ে একটা সঙ্কীর্ণ কাঠামোয় ধরান হচ্ছিল, এখন ওই কথাটার সংজ্ঞা ভালো করে ভেবে দেখবার একটা তাগিদ এসেচে। তেমনি আমার মনে হচ্চে মাতৃত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি করলেও ফল তার ভাল হয় না, অন্ততঃ এরই মাঝে যে নারীর শত সহস্র অস্ফুট কামনা – আশা এবং আদর্শের পূর্ণ তৃপ্তি রয়েচে একথা অসংশয়ে ধরে নেওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে রোঁলার কয়েকটি কথা ভারি ঠিক মনে হয়েছিল—

'How utterly lonely a woman is! Except children nothing can hold her; and children are not enough to hold her for ever; for when she is really a woman, and not merely a female, when,

she has a rich soul and an abounding vitality she is made for so many things—"

—John Christopher.

সমী হাসিয়া কহিল, কিন্তু এই 'so many things' সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা চাই ত? তোমরা যদি কেবলই ভাসা ভাসা ভাবরাজ্যে এবং অস্পষ্ট কাব্যকুয়াশায় নিজকে আবৃত করে রাখ, তাহলে কেমন করে হবে?

দীপ্তি কহিল, সেই কথাই ত আমি বলচি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আকুলতা বেশী কিন্তু শক্তি স্বল্প, কেবল একটি মাত্র বস্তুতে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাহরণ করে নিয়ে যে সৃষ্টির সাধনা তা পারিনে, একটা দিকে পরিণতি দিতে যেয়ে আর সমস্ত দিককে শুষ্ক রাখতে আমাদের বেদনা বোধ হয়। অনন্তের প্রতি আকুতি আমাদের সীমাহীন অথচ সমস্ত জীবনকে বিদীর্ণ করে' একে রূপ দিতে পারিনে। তুমি কি ভাব, ভিতরে ভিতরে এই যে আমাদের রুদ্ধ অক্ষমতার ক্লেশ, এ কোনও বেদনার চেয়ে কম? রোঁলার ঐ বইতেই এই কথা নিয়ে ভারি সুন্দর কথা চোখে পড়েছিল,

"An intelligent woman has much more than a man, moments of an intuitive perception of things eternal; but it is more difficult for her to maintain her grip on them. Once a man has

come by the idea of the eternal, he feeds it with his life-blood, a woman uses it to feed her own life, she absorbs it, and does not create."—Romain Rolland—John Christopher..

—জানি না তুমি এ নিয়ে কখন ভেবেচ কি না !

সমী কহিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালে কে না জানে যে, specialisation-এর প্রসার ক্রমশঃ কেমন করে বেড়ে চলেছে। জীবন-ব্যাপারে জটিলতা এত বেড়েচে যে, একটি মাত্র ক্ষেত্রে আজীবন specialisation চালালেও তার কত অংশ অনধিগম্য থেকে যায়, একটা দিককে নির্ব্বাচন করে নিতে হ'লেই অনেক দিকে শুষ্ক থাকতে হবে, এতে চিত্তবৃত্তির যে বেদনা সেও তোমাদেরকে বহন করতেই হবে।

দীপ্তি অধৈর্য্য হইয়া কহিল, আমি শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে specialisation-র কথা বলচিনে, আমি বলচি জীবনের সর্ব্ব-ব্যাপারে, সমস্ত চেষ্টায় আমাদের অনেকগুলো ছোট ছোট personality রয়েচে, তাদের একটাকে তৃষ্ণার্ত্ত রেখে আর একটার চর্চ্চা করতে গেলে আমাদের দেহ মন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তোমাদের personalityকে একই বিন্দুতে সংহত করে একরোখাভাবে তোমরা সাধন করতে পার। এই যে এখনি 'মাতৃত্বে'র কথা বলছিলে, আমার কি মনে হয় জান, কবির মানসলোকের সৃষ্টিতে যখন নূতন সৃষ্টির বেদনা সঞ্চার হয়, তখন তারই উত্তেজনায়, আবেশে, মাধুর্য্যে, সৃষ্টির মুহূর্ত্ত যে

অপরিসীম আনন্দে পূর্ণ হয়ে থাকে,—স্ত্রীলোকের জৈবিক সৃষ্টির বেদনায় তেমনি একটা শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত রয়েচে কিন্তু সৃষ্টির ক্ষণকাল যে চিরদিনের নয়—এবং তারই সঞ্চিত অনুভাব দিয়ে সমগ্র জীবন পূর্ণ করা যায় না, এ কথাই বা কে না জানে?

সমী উদাস হইয়া অশ্বত্থ গাছের একটা মর্ম্মরিত শাখার প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাদের জীবনেও যে একটা দিকের তপস্যা করতে যেয়ে জীবনের অনেক দিনের অতৃপ্ত কামনার ব্যথা সঞ্চিত হয়ে নেই, সেখান থেকে যে একদিনও অশ্রুমোক্ষণ হয় না, এ কথাই বা জানলে তুমি কি করে? তুমি ওই যে সৃষ্টির ক্ষণকালের কথা বল্‌লে ও সর্ব্বক্ষেত্রেই সমান, সে বিদ্যুৎসঞ্চারময়ী বেদনা নিমেষেরই, তাকে চিরকাল ধরে রাখতে চাইলেও রাখা যায় না। তারপর যে অবসাদ, যে শ্রান্তির মুহূর্ত্ত আসে তাকেও জীবনে নিঃশব্দে আহ্বান করে নিতে হয়। কিন্তু তোমাদের দেহপ্রকৃতিতে এবং মানসপ্রকৃতিতে মাতৃত্বের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্খা রয়েচে একথা বললেই যে এমন বলা হয় যে, তোমাদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য ওতেই নিঃশেষ হয়েচে এ ত মনে হ'বার কথা নয়। বরঞ্চ আমার মনে হয়, মাতৃত্বের ভিতর দিয়ে তোমাদের জীবনে যথার্থ সামঞ্জস্য (harmony) এবং proportion আসে। জীবনের বহুধা কর্ম্মক্ষেত্রে তোমাদের নিহিত শক্তিকে আরও প্রগাঢ় করে উপলব্ধি করতে পার এবং এর বিচিত্র নানা সমস্যায় তোমাদের ঔৎসুক্য আরও বেড়ে যায়।

দীপ্তি কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সেদিন এক সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় চোখে পড়ল, একজন লেখিকা লিখেচেন, "স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের জ্ঞানলোকের এবং ভাবলোকের আদান-প্রদানে স্ত্রীলোকে তার ব্যক্তিত্বের মাধুর্য্যকে কথায়, হাসিতে, চিন্তা প্রকাশে, ব্যবহারে, নানাপ্রকারে নিরন্তর যে প্রকাশ করতে চায়, এইটে পুরুষের চিত্তবৃত্তির কাছে কম প্রাপ্তি নয়।" কিন্তু এ কথাটা পড়ে অনেকে মনে করতে পারে, এতে করে স্ত্রীলোকের coquetry করবার প্রবৃত্তিকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্চে।

সমী হাসিয়া কহিল, coquetryকে রুচিবাগীশ মাত্রেই যৎপরোনাস্তি শক্ত কথা বলে কিন্তু তুমি এই ত আশঙ্কা করচ যে স্ত্রীলোকের coquetry'র সঙ্গে তার মাধুর্য্য বিকীর্ণ করবার চেষ্টা কি কোন স্খলিত মুহূর্ত্তে এক হয়ে যায় না?

দীপ্তি কহিল, হাঁ তাই, আমার একথা অনেকবার মনে হয়েচে যে, তুমি তোমার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যে তৃপ্তি পাও, আমার সাহচর্য্যের আনন্দ তোমার কাছে কি তার চেয়ে অন্য রকম নয়?

সমী কহিল, কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে অন্ততঃ গোড়াকার দিকের গুটিকতক আইডিয়া এবং outlook একেবারে ভিন্ন হলেও যে তার সহিত গভীর এবং স্নিগ্ধ বন্ধুত্ব হবে এ কথাটা ভুল। তাই আমার পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে তোমার সঙ্গলাভের ঐক্যের দিকটার এই দিক দিয়ে মিল রয়েচে। কিন্তু স্থায়ী মনোমিলনের

এই অংশটা বাদ দিলেও আরও যে একটা কথা বাকী থেকে যায় সেখানে নিঃসন্দেহই তোমার সংস্পর্শের ভিতর অন্য রকম আনন্দ পাই। সেখানে তোমার মাথা-ঘষার যে একটু গন্ধ আসে এবং ঘনপক্ষ্মের ভিতর যে নিঃশব্দ মাধুর্য্য রয়েচে, তাকে আমি লেশমাত্র উপেক্ষা করতে পারিনে।

দীপ্তি কহিল—কিন্তু এমনও ত হতে পারে, হয় ত তোমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতেই আমি নিজেকে আরও মাধুর্য্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করবার জন্যে ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করচি। একে তুমি কি বলবে? Charm বলতে পার কিন্তু coquetry বলবার আশঙ্কাও রয়েচে।

সমী হাসিয়া কহিল, এইখানে একটুখানি সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং সঙ্গতিজ্ঞান থাকলেই স্ত্রীলোকে একটাকে আর একটার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে পারে না। পুরুষের চিত্তের উপর স্ত্রীলোকের এই দিককার অনিবার্য্য আকর্ষণের প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু হাতে তাঁদের এই বিপুল শক্তির উৎস রয়েচে বলেই তাঁদেরকে এর ব্যবহার প্রকৃত আর্টিষ্টের মত—সৌন্দর্য্যের এবং সংযমের পথে করতে হবে। কিন্তু কি জান, বিপদের ভয় রয়েচে বলেই এর ভিতর এত আবেগ, এত শঙ্কা, এত-খানি মাধুর্য্যের সৃষ্টির সম্ভব হয়েচে। যেখানে মানুষের চিত্তবৃত্তি সক্রিয় সেখানে তারই কম্পমান আঘাতে কত বেদনা, কত বিপ্লবই না হতে পারে কিন্তু এর সমস্ত ক্ষতিকে তুচ্ছ করেও সৃষ্টির যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তার দাম এদের চেয়ে অনেক

বেশী। তাঁই আমি মনে করি, যেখানে বিপদ এবং জটিলতার আশঙ্কায় সকল্প প্রকার আবেগকে অনুভবকে মুহ্যমান বিবর্ণ করে তোলবার ব্যবস্থা রয়েচে, বিধি তার যতই সুরক্ষিত হোক সমস্ত নরনারীর মঙ্গল এতে হয় না। নিরাপদ হওয়ার ব্যাকুলতা এবং যথার্থ কল্যাণ এদুটো এক বস্তু নয়। তা ছাড়া পুরুষে ছোট বড় সকল কাজে স্ত্রীলোকের কাছে যে মাধুর্য্যের প্রেরণার দাবী করে, তা যে কেবল গুটিকতক অসাধারণ নারী গুটিকতক প্রতিভাবান পুরুষকে দিতে পারে তা মনে কোরো না। এক্ষেত্রে, সমাজের সার্ব্বজনীন একটা দাবী রয়েচে। বসন্তসেনা এবং চারুদত্ত, Hetairae এবং সক্রেটিস্—সমাজে এঁদের সম্বন্ধ-সূত্রেই যে স্ত্রীলোকের প্রেরণা উজ্জ্বলতম হয়ে রয়েচে তা নেই। সমাজের সমস্ত শ্রেণীতেই লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে এই শক্তির গূঢ়ভাবে কাজ করবার প্রয়োজন রয়েচে। এ সম্বন্ধে ভারি সুন্দর গুটিকতক কথা শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'তারুণ্য' বইখানায় চোখে পড়েচে, —"সমাজে নারী মাত্রেরই কাছে সমাজের পুরুষ মাত্রেই দৃষ্টিসূত্রে একপ্রকার মাধুর্য্য পায়—যা পর্দ্দাগুণ্ঠিত দেশে পুরুষের ভাগ্যে জোটে না। নারীর মাধুর্য্যই পুরুষের শক্তি। ইউরোপের পুরুষ কোথা থেকে এত শক্তি সংগ্রহ করে' এমন ঐশ্বর্য্যময় হয়ে ওঠে, দূর থেকে আমাদের তা অভাবনীয় মনে হয়।" "—বলা বাহুল্য passionএর সঙ্গে painএর সোদর সম্বন্ধ। ইউরোপের লোক আমাদের তুলনায় ঢের অসুখী। কিন্তু এত অসুখী বলেই এত সৃষ্টিশীল।" ('তারুণ্য')

ইহার পর দীপ্তি কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই সমী হাসিয়া কহিল, আমার নিজের জীবনের একটা অভিজ্ঞতা তোমাকে বলি শোন, এইটের থেকেই বুঝতে পারবে স্ত্রীলোকের মাধুর্য্য এবং coquetryর ভিতর যে ব্যবধানের পর্দ্দাটা রয়েচে, তাকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেও কত সময়ে এর proportion ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। একটি চিন্তাশীল এবং গভীর প্রকৃতির স্ত্রীলোকের সহিত আমার পরিচয় ছিল। তাঁর সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনায় তাঁর চিত্তের গভীরতা এবং চিন্তার প্রসারতার দিকটা সহজেই অনুভবগম্য হয়ে উঠ্‌ত। এবং তিনি ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। অথচ আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অনেক সময়ে দেখেচি, তাঁর হাসিতে, ইঙ্গিতে, কটাক্ষে, শিঞ্জনে এমন একটা আভাস প্রায়ই প্রকাশ পেত যার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং যা তিনি অনায়াসে না করলেও পারতেন। আগেই বলেচি, বুদ্ধি ছিল তাঁর নিরতিশয় তীক্ষ্ণ, কিছু বলবার পূর্ব্বেই মনের ভাব ধরতে পারার ক্ষমতা তাঁর কাছে স্বাভাবিক ছিল।

দীপ্তি কি কহিতে যাইতেছিল ; সমী ঈষৎ হাস্যে তাহাকে নিরস্ত করিয়া কহিল, সবটা বলি শোন, একদিন তিনি স্মিত মুখে বলিলেন, 'দেখ এটা আমি বেশ বুঝতে পারি, হাসিতে, কেশে এবং বেশে এই যে উচ্ছলতার পরিচয় মাঝে মাঝে অসম্বৃত হয়ে পড়ে এটা না হলেই ছিল ভাল, কারণ এতে তোমার পুরুষচিত্তের একটা দিক যদিচ অনিবার্য্য বেগে আকৃষ্ট হচ্ছে, মনের উপর তলায় শ্রদ্ধার পৃষ্ঠায় তেমনই অনুপাতে একটা

মোটা ক্ষতির অঙ্কপাত হয়ে আসচে। অথচ একে বুদ্ধি দিয়ে পরিষ্কার করে বুঝতে পারলেও নিরস্ত করতে বেগ পেতে হয়। বোধ করি এমনই হয়। এমন গুটিকতক জিনিষ আছে, যাকে যুক্তি দিয়ে আমরা বিচার বিশ্লেষণ করলেও অতিক্রম করে যেতে পারিনে।'

দীপ্তি কহিল, কিন্তু এই কথাটা নিয়ে তোমার সেই বান্ধবীর সঙ্গে মুখে মুখে অনেক তর্ক হয়েচে?

সমী মাথা নাড়িয়া কহিল, তা হয়েচে বটে কিন্তু সেটা অবান্তর —আমি সেদিন, মনে রয়েচে, বিধিমত ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, আমার বিশ্বাস ছিল কোন তরুণী স্ত্রীলোকের সঙ্গে এ রকম কথা-বার্ত্তা কল্পনাও করতে পারা যায় না। সেখানে উভয়ের মাঝ-খানে বরাবর একটা পর্দ্দার আড়াল থাকবেই—তার কারুকলা যেমন কৃত্রিম তেমনি ঝাপ্‌সা। কিন্তু তাঁর আন্তরিক অকুণ্ঠা আমাকে স্পর্শ করেছিল—তাই সত্যকে লেশমাত্র গোপন না করে সহজভাবে বললুম, হাঁ ভাই, আপনার এই উচ্ছলতা, আমার পুরুষের চোখে হয়ত খারাপ ঠেকেই না, এমনকি বাড়াবাড়ি না হলে ভালই লাগে, কিন্তু মনের আরও যে একটা জমাখরচের দিক রয়েচে, সেখানে শ্রদ্ধার উপর ছায়া পড়ে। আপনার প্রশান্ত চিন্তাব্যঞ্জক ললাটে এবং গভীর দৃষ্টিতে যে তৃপ্তি পাবার উপায় রয়েচে তার ভিতরেই আমাদের বন্ধুত্বের শ্রেষ্ঠ এবং প্রগাঢ় অংশ রয়েচে।

দীপ্তি কহিল, তুমি যতই বড় বড় কথা বলো আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর আমাদের দেহের এতটুকু প্রভাব নেই এই কি

তুমি মনে করেচ? তা যদি মনে করে থাক্‌ত ভুল করেচ।

সমী কহিল, না তা আমি মনে করিনে। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ প্রত্যেকেরই personality বোঝাতে দেহ এবং মনের সূক্ষ্ম শত সহস্র রহস্যময় সমাবেশ বোঝায়—কোনটাকেই এর উপেক্ষা করা চলে না। দেহকে সর্ব্বপ্রকারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ করে সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের চর্চ্চায় কোনদিনই আমার ব্যগ্রতা নেই। কিন্তু কোন বিশেষ সুরের সঙ্গীতের মাঝে একটা পর্দ্দার আবশ্যক রয়েচে বলে' যদি সেই পর্দ্দাটা তার পরিমিত মাত্রাকে ছাড়িয়া কেবলই অত্যুগ্র হয়ে ওঠবার চেষ্টা করে তবে তাতে করে সুর-চর্চ্চার আদর্শের যেমন ব্যাঘাত ঘটে তেমনি দেহের আকর্ষণকে কৃত্রিম উপায় এবং ভঙ্গিমা আশ্রয় করে' অহরহ চোখে পড়াতে চাইলে সমগ্রের সৌন্দর্য্য যায় নষ্ট হয়ে। তাই বলছিলাম, পুরুষের চিত্ত-লোকে স্ত্রীলোকে যে মাধুর্য্যের ছায়া সঞ্চার করে সেটা তাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। মেয়েদের এই প্রভাব এবং আকর্ষণকে সহজ করে রাখতে পারলেই ভালো। এ শক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে সঙ্গতিচ্যুত করে, উগ্র করে তোলবার প্রয়োজন দেখতে পাইনে।

দীপ্তি কহিল, সেদিন নারী সম্বন্ধে একজন স্ত্রীলোকের লেখায় পড়লাম; তিনি লিখেচেন, 'concubinage জিনিষটা চিরকালই পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলে আসচে, অথচ যেকালে এবং যে দেশে একেই একান্ত অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় নাই সেই দেশে তখনকার সমাজ যে তাতে করে না ঠকে বরঞ্চ লাভবান

হয়েচে এবং সমাজের চোখে অশ্রদ্ধার ছায়া ঘনিয়ে আসে নাই বলে' স্ত্রীলোকেরাও নিরন্তর আপনাকে হীন ভাবার গ্লানিতে নীচে নেমে যান নি, বরঞ্চ আপনার সম্ভ্রম এবং শোভা অক্ষুণ্ণ রেখেচেন, এর নজীর রয়েচে।' একথার ভিতর অসন্দিগ্ধ সত্য রয়েচে বলেই মনে হয়। অথচ অনেকে এই কথাটাকে অবলম্বন করে যৎপরোনাস্তি শক্ত কথা বলাবলি করেচেন।

সমী হাসিয়া কহিল, করেচেন নাকি? কিন্তু কি জান, concubinage, coquetry এই সমস্ত কথা বহুদিনের প্রচলিত ব্যবহারের ফলে এমনই একটা সঙ্কীর্ণ নামের কাঠামোর ভিতর প্যাক হয়েছে যে, এদের বিষয়ে কিছু আলোচনা করবার মত সহিষ্ণুতা এবং যুক্তি কম লোকেরই রয়েচে। প্রাচীন ভারতবর্ষে যখন বসন্তসেনার সঙ্গে বিবাহ হওয়া চারুদত্তের মত সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের পক্ষে অপমানজনক কিনা, এ প্রশ্ন একবারও উঠত না এবং গ্রীসে Diotima সক্রেটিসের মত দার্শনিকের সঙ্গে সমান ভাবেই মিশতে পারতেন, তাঁর পদমর্য্যাদার গৌরব সক্রেটিসের প্রতিভায় ছায়ার মত লেগে রয়েচে কিনা সে কথাটা একান্তই অবান্তর ছিল। তখনকার সমাজ নরনারীকে এই পরিসর এবং শ্রদ্ধার ক্ষেত্র দিয়ে কত লাভবান হয়েচে সেটা তৎকালবর্ত্তী ইতিহাসের পাতাতেই স্পষ্ট রয়েচে। যে সমাজে প্রেমকে যত বিশ্বাস করে' অধিকার দিয়েচে সেই সমাজেই পুরুষের প্রতিভা সেই অনুপাতে সর্ব্বব্যাপী হয়েচে। এই নিয়ে আধুনিক য়ুরোপকে আমরা যতই অবিশ্বাস করি এবং শক্ত কথা বলি, এই কি

প্রমাণ হয়েচে যে তাদের দেশে স্ত্রীলোকের মাধুর্য্যের এবং প্রেমের শক্তিকে বিস্তৃত পরিসর দিয়ে তারা জ্ঞানে, কর্ম্মে, বীর্য্যে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রমাগত বড় হয়ে চলেছে এবং ভারতবর্ষ প্রাচীন সতর্ক বিধিকে যতই আঁট করে বাঁধতে যাচ্ছে, তার দৈন্য, তার জীর্ণতা ততই শতধা হয়ে ফুটে উঠচে।

দীপ্তি চুপ করিয়াছিল, কিছুকাল পর কহিল, ওই যে তুমি এখনি একটা কথা বললে যে coquetry প্রভৃতি কথার চারিদিকে এমনই একটা স্বভাবতঃই অসুন্দর আবরণ রচনা করা হয়েছে যে, যারা "অগ্রাম্য পরিহাসকুশলঃ" তারা কথাটাকে মাত্র কিছুতেই আমল দেবে না, অথচ এত অসহিষ্ণুতার কারণ কি ঘটেচে? এই সম্পর্কে একটা কথা আমার মনে হচ্চে, তুমি যে স্ত্রীলোকের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যের কথা বারবার বলচ, তোমরাই কি কেবল এইটে নারীর কাছে দাবী কর? স্ত্রীলোকের অন্তপ্র্র্কৃতিতেও কি পুরুষের কাছে মাধুর্য্যের এই দাবী নেই?

সমী হাসিয়া কহিল, কি তুমি বলতে বসেচ এবং কথাটা যে কি জিনিষ উল্লেখ করে—সেটা বুঝেচি। আজকাল 'লুডোভিকির' বই পড়ার পর কেহ কেহ বলচেন যে, নারীর মাধুর্য্য এবং পুরুষের প্রতিভায় এর অবদান, এ সকলই সাজান কথা, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে মোটা কথা এবং সমস্ত কথার মূলে রয়েচে সেটা sex-urge, একেই সাজিয়ে-গুছিয়ে দাঁড় করিয়ে এইসব বড় বড় কথার সৃষ্টি হয়েচে এবং এ ভাবে দাম বাড়াতে একমাত্র নারীই চায়, পুরুষে coquetry করে না, কারণ তার প্রয়োজন নেই।

দীপ্তি গম্ভীর হইয়া কহিল, এখন হে পুরুষ, তোমার এ সম্বন্ধে মত কি ?

সমী কহিল, সাজান-গোছান সম্বন্ধে এইমাত্র আমি বলতে পারি, sex-urge যে এর মূলে রয়েচে একথা আধুনিক কালে কেউ অস্বীকার করবে না—যাঁহারা সত্যিকার বিজ্ঞানের তপস্বী, তাঁরাও না এবং যাঁরা ফ্রয়েড নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে থাকেন তাঁরাও না, কিন্তু তোমাব দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে একটু অন্যরকম বলে মনে হচ্চে।

দীপ্তি ঔৎসুক্য ভরে তাহার দিকে চাহিল।

সমী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, আমি তোমার কাছে facts এবং figures দাখিল করব না, কেবল আমার নিজের স্মৃতির থেকে একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনা বলচি। এই ত সেদিন আমার একটী বন্ধুকে দেখেছিলাম, সোফার উপর বসে একজন অদূরবর্ত্তিনীকে লক্ষ্য করে সে 'পূরবী' পড়ছিল। মানুষের যাকে মনে লাগে তার কাছে সমস্ত অস্তিত্বকে মধুর করে প্রকাশ করবার কামনা যে কেমন করে অহর্নিশ উদ্যত হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে বোধ করি বা তার সচেতনতার অবধি থাকে না। ল্যাম্পের শেড্ দেওয়া আলো ঘরটার একাংশে এসে পড়ে' আলো এবং দীর্ঘ-ছায়ায় রহস্য রচনা করেছিল। সে একমনে 'পূরবী' পড়ছিল, অথচ জানেও না যে কেমন করে তার কণ্ঠস্বর, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমস্ত ভঙ্গী—এমন কি চাদর নেওয়ার ধরণটা অবধি আপনা-আপনি মধুর হয়ে উঠেচে।

দীপ্তি হাসিয়া কহিল, কিন্তু এ তোমার কোন তর্কসভায় মঞ্জুর হবে না।

সমী কহিল, না-ই বা হোল, এ না-মঞ্জুর হয়েই থাক্। পুরুষে দাম বাড়াতে চায় কিনা জানিনে, কিন্তু তার বাইরেকার সমস্ত অকিঞ্চিৎকরতাকে ভেদ করিতে ভিতরকার সত্যকে কেমন করে সে প্রত্যক্ষগোচর করে তুলবে, কেমন করে এ অধিকার অর্জ্জন করা যায়, এইদিকে প্রচেষ্টার তার অবধি নেই। তাই তোমার কথার উত্তরে আমি বলব, স্ত্রীপ্রকৃতি পুরুষের কাছে মাধুর্য্যের দাবী করে কিনা জানিনে, কিন্তু তোমাদের কাছে আমাদেরও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার আকাঙ্ক্ষা কারও চেয়ে কম নয়।

দীপ্তি কহিল, সেদিন একটা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় চোখে পড়ল, কেউ বোধ করি কোন নির্ম্মম সাহসিকতার মুহূর্ত্তে লিখে বসেচেন, "traditional morality"র স্থান যদি artistic temperament দিয়ে পূর্ণ করা যায়—মোটের উপর ফল তাতে মন্দ হয় না।" এতে অনেকে বলেচেন, এ কথার কোন মানে হয় না। প্রথমতঃ ও দুটো কথাই এত অস্পষ্ট এবং তারপর একটার স্থানে আর একটাকে যে কেমন করে বসান যায় সেটা ততোধিক অবোধ্য।

সমী কহিল, artistic temperament নিয়ে বোধ করি কেহ কেহ এমার্সনের রচনার একাংশ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে বসেচেন যে, যারা ললিতকলা-বিধির রাজ্যে সমঝদার, তাদের কাজও selfish এবং sensual, অতএব artistic temperamentএর

যে কেমন করে অর্থ বোধ হতে পারে, এর একটা ধারাবাহিকতা পাওয়া গেল না এবং এই দিয়েই বা কি করে যে সর্ব্ববিধ স্খলন এবং ত্রুটির উচ্ছেদ হতে পারে তার লেশতম আভাস মিলিল না।

দীপ্তি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ তাই বটে, এমার্সনকেও আনা হয়েচে। কিন্তু এমার্সন এখন থাক। সহজ ভাষায় গোটাকতক কথা বল। আমার মনে হচ্চে, কথাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। Artistic temperament বলতে কি তুমি বোঝ? এবং কথাটার সীমা নির্দ্দেশই বা করবে কি দিয়ে?

সমী কহিল, মানুষের চরিত্রের বিকাশ এত ব্যাপক ও রহস্যময় যে, তার একটা দিকের পরিণতি দেখে সেই ছাঁচে আগাগোড়া সমস্তটাকে মিলিয়ে দেখতে বসার মত ভুল আর নেই। একজন গায়কের কথা তোমাকে বলেছিলাম।

দীপ্তি কহিল, হাঁ, গান তাঁর সকলের কাছে সুমুখে বসে শোনা প্রায় অসম্ভব কিন্তু তাঁর শক্তির অপরিসীম আভাস কয়েক মিনিটের তানালাপের অবকাশেই গ্রামোফোনের রেকর্ডের ভিতর দিয়ে পাওয়া যায়।

সমী কহিল, আমি সামনে বসে শোনার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম; জীবনের কাহিনী তাঁর যেমন অসুন্দর তেমনি অনুদার। এবং তাঁর যৌবনের অমিতাচারে শীর্ণ, সাধারণ মুখে যে কোন বিশেষত্ব রয়েচে তা মনেও হয় না, অথচ তিনি যখন গান করতে বসেন তখন মনে পড়ে না যাকে সহজ চোখে প্রথমে দেখেচি তার সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য রয়েচে। তাঁর মধ্যে যে সৌন্দর্য্য-

পিয়াসী, তার সমস্ত সৌকুমার্য্য এবং অনির্ব্বচনীয়তা নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করতে বসেচে—সে তখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। দেহের নির্ম্মলতা অথবা অশুচিতা সে বস্তুকে এতটুকু আচ্ছন্ন করেনি। এতে কি প্রমাণ হয় জানিনে কিন্তু এইটে বুঝতে পারি—যারা সৌন্দর্য্যের দেখা পেয়েচে, সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তাকে রূপ দিতে পেরেচে তারাই যে সকল সময়ে নিজের সমগ্র জীবনে তাকে তর্জ্জমা করে দিতে পেরেচে এ কথাটার বিপরীত দৃষ্টান্তের অভাবও সংসারে নেই।

দীপ্তি কহিল, কিন্তু নীতিশাস্ত্রের শত সহস্র বিধি-নিষেধ আজ অবধি বহুলোকের মুখে মুখে কণ্ঠস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাদের অনেকের জীবনে যে অসৌন্দর্য্যের অভাব নেই এ কথাটাও বোধ করি তেমনি সত্য।

সমী কহিল, বস্তুতঃ এ ধরণের কথার জোর করে একটা মানে বেঁধে দেওয়া কঠিন। পৃথিবীতে অন্যায়, অসৌন্দর্য্য, দুর্ব্বলতা চিরকাল থাকবে বলেই রয়েচে, অতএব এদেরকে আগাগোড়া উচ্ছেদ করব বলে কোন নীতির প্রবর্ত্তনা করতে গেলে সেটা মিথ্যে হয়ে দাঁড়াবেই। তা সে নীতি conventional morality-র মত বিধি-নিষেধ পূর্ণ নেতিমূলকই হোক বা কবি তাঁর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অদৃশ্য প্রভাব দিয়ে artistic temperament গড়ে তুলবার ভার নিয়ে যে না-মাঞ্জুর নীতির প্রবর্ত্তনা করেচেন সেই হোক। কিন্তু নেতিমূলক নীতিকে artistic temperament দিয়ে পূর্ণ করতে চাওয়ার সম্বন্ধে আর এক দিক দিয়ে কিছু বলা

যায়। স্ত্রীলোক এবং পুরুষের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দিকটা নিয়ে তারা সহজেই আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে এবং অবলীলাক্রমে বিহিত থেকে অবিহিতে যেয়ে উত্তীর্ণ হয়, তাকে সংবরণের সীমার ভিতর রাখবার জন্য কেহ বা একে কামিনী-কাঞ্চনের ভয় দেখিয়ে মুহ্যমান রেখে নিরাপদ হতে খুঁজেচেন এবং আর একদিকে কবির কাব্যে এর অপরিমেয় সৌন্দর্য্য এবং রহস্যের দিকটা ফলিয়ে তুলে এর মন্দ অংশটাকে অকিঞ্চিৎকর করে তুলবার চেষ্টা রয়েচে। এর একটা হচ্চে শুধু নিষেধ, তার মধ্যে কেবলই বিধান এবং একটা শূন্য 'না' ছাড়া আর কিছুই নেই। এবং আর একটা হচ্চে সৃষ্টি। Artistic temperament কথাটা বোধ করি অস্পষ্ট; কিন্তু যারা সৃষ্টির রহস্য এবং সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণকে অনুভব করতে পেরেচে তাদের জীবনের উপর সমগ্রভাবে সে যে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি এ কথা অসংশয়ে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন।

দীপ্তি কহিল, কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র এখনি মাথা ঝাড়া দিয়ে বলবে, "দরকার নাই আমাদের অত সাহসের, অত সৌন্দর্য্যের, অত দীপ্তির। এর ভিতর যে সৃষ্টির আবেগ, যে বেদনা রয়েচে, সে যে কোথায় কি বিপ্লব ঘটাবে তার ঠিকানা রয়েচে? এর চেয়ে অনুভব শক্তিকে সক্রিয় হতে দিও না। যুক্তির প্রবৃত্তিটাকে দাও গোড়া ঘেঁসে কেটে। এর চেয়ে আমার পুঁথির পাতার নেতিমূলক বিধি-বিধান ঢের বেশী সুরক্ষিত, এতে এত চেষ্টার লেশও লাগে না। আমাদের দেশে নিকৃষ্ট

অধিকারীর পক্ষে নিরাপদ সাধনাই প্রশস্ত। প্রতিমা-পূজার এবং ইতিহাসের শত সহস্র দৃষ্টান্ত এর নজীরের অভাব নেই।

সমী কহিল, কিন্তু থাক্ ও কথা, এখনি হয় ত কে কোথায় গায়ে নেবে, আমি শুধু বলছিলাম, আমার পক্ষে মানা কঠিন। আমার একজন বন্ধুকে জানি, স্নানের পর তার ঘরের থেকে ধূপের গন্ধ আসে এবং সেই সময় অনেক দিন তাকে শেলী পড়তে দেখেচি কিম্বা এস্রাজে কোন প্রিয় সুরের একটুখানি মৃদু আভাস ঘর থেকে আসতে শুনেচি। শেলী কিম্বা Godwin-এর morality কোন দিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আলোচনা করেচে কিনা, এ আমার মনে পড়ে না, অথচ সেই আশ্চর্য্য কবির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ছায়া কেমন করে যে তার জীবনের উপর পড়েছিল, সে ত দেখেচি। সে কেবল মাত্র তার রুচি ছিল না এবং তার সৌন্দর্য্য-বোধকে তৃপ্ত করত না। কাব্যে তৃষ্ণার সঞ্চার করা ছাড়াও সে তার জীবনের অনেক কাজে, অনেক ভাবনায়, ব্যবহারে, ব্যক্তিত্বে সৌকুমার্য্য এনে দিয়েছিল।

সমী চুপ করিয়া অন্যমনস্ক হইয়া অস্তমান ক্ষীণ চন্দ্ররেখার দিকে চাহিয়া ছিল।

দীপ্তি হাসিয়া কহিল, এখন তোমার সেই বন্ধুকে বাতির আলোয় যদি দু' একটা শেলীর কবিতা পড়ে শোনাই তাতে বোধ করি তিনি আপত্তি করবেন না।

সমী মাথা হেলাইয়া বলিল, না, তা করবেন না।

[আলাপ আলোচনা

[ছয়]

দীপ্তি একটা মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল : এক কবির একখানি হিন্দি কবিতা পড়িলাম, কবিতার নাম 'আলসী'। এ কবিতা পড়িয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছেন, তোমার কাছে অস্বীকার করিয়া আর কি হইবে আমিও বিধিমত উচ্ছ্বসিত হইয়াছি, কিন্তু অবশেষে একটা কথা ভাবিয়া অবাক হইতেছি বিষয়বস্তুটি কি না 'আলস্য'। কিছুর মধ্যে কিছুই নয় নেহাৎ আলস্য। সমস্ত মনের শিথিল আবেশে গা মেলে দেওয়া, নেশার মত প্রবল, প্রগাঢ়, মধুর আলস্য! ভাবিয়া দেখ, আলস্যের ওপর কবিতা লইয়া আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর মত ব্যস্তবাগীশ, রসলেশহীন যুগ কিরূপে এত মাতিয়াছে? আর আমিই বা এত মুগ্ধ হইতে গেলাম কেন?

সমী সকাল বেলাকার স্নিগ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়াছিল, প্রশ্ন শুনিয়া কহিল : ব্যাপারটা কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় আগা-গোড়া সমস্তটাই ইতিহাসের অন্তর্গত।

দীপ্তি চমকিয়া উঠিল, কহিল : এমন সকাল বেলাটা ইতিহাসের পুঁজি-পাথি আর নজির পাড়িয়া মাটি করিও না। না হয় আমার প্রশ্নের উত্তর অনুচ্চারিত থাক।

সমী কহিল : তোমার প্রশ্নের উত্তর অল্ডাসের একটি প্রবন্ধ পড়িলেই আপনা-আপনি দেওয়া হইয়া যাইবে। সে প্রবন্ধের নাম করিব কি?

দীপ্তি—কেন নিজের ভাষায় কুলায় না? অবশেষে কথা এবং চিন্তা ধার করিতে হয় সাত সমুদ্রের পরবাসী ইংরেজ লেখক অল্ডাস্ হাক্সলির কাছ হইতে!

সমী—লুকাইয়া আর কি হইবে, হাক্সলির লেখা যত পড়িতেছি দেখিতেছি আমার চিন্তা কখন তাঁহার চিন্তা হইয়া গিয়াছে—এত মিল যে কোন্‌টা আমার মত আর কোন্‌টা তাঁহার মত এ দুইয়ে ভারি গোলমাল হইয়া যাইতেছে। এইটুকু কেবল অতিশয় স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, আমি যে সকল কথা বলিতে চাই কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাই না, সেই সবই তাঁহার মুখ হইতে একান্ত অনায়াসে সুমধুর ভাবে বাহির হইয়া আসিতেছে।

দীপ্তি—জানি তোমার অল্ডাস-প্রীতি। আজকাল তাহা ক্রমশঃ সম্ভব হইতে অসম্ভবের সীমায় যাইয়া ঝুঁকিতেছে।

সমী—তবে আমার এই মাত্র গর্ব্ব যে এই খ্যাতনামা ইংরেজ ঔপন্যাসিক আজকাল অনেকের মনোহরণ করিতেছেন। এ যুগের নরনারী ক্রমশঃ আবিষ্কার করিতেছে, যে অল্ডাসের লেখার সহিত তাহাদের মন ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ অল্ডাস্ যেন এ যুগেরই লেখক, তাহার অর্থ তিনি যে দৈবক্রমে কালিদাসের কালে জন্ম ল'ন নাই শুধু তাহাই নয়, এ যুগের দোষ, গুণ, সাধনা, বেদনার পালা তিনি যেন নিঃশেষে আপনার মাঝে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। এ যুগের মর্ম্মস্থানের সন্ধান তাঁহার লেখায় খুব বেশী করিয়া আমরা পাই।

সমী ও দীপ্তি

এ যুগের অভীপ্সাকে তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েচেন, এ যুগের ব্যর্থতা, বেদনা এবং দুর্ভাগ্যের ধারাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নির্ম্মম আলোয় তন্ন-তন্ন করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

অল্ডাস্ ইনটেলেক্‌চুয়াল্ লেখক। তাঁহার জীবনের এবং সৃষ্টির মোটামুটি ভ্যালুয়েশনগুলোও স্পষ্টরূপে এইদিকে। তাই তাঁহার অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণের বহি যা কিছুই পড়া যাক্, মূল সুরটা তার নিরতিশয় প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা পড়চে। সেটা হচ্চে এই যে: হৃদয়াবেগের আতিশয্য, সস্তা আইডিয়া-লিজ্‌মের প্রাচুর্য্য উচিত অনুচিতের প্রখর বিবেকবোধ এ সকল সংস্কারকে দূরে সরিয়ে রেখে' পরিষ্কার স্বচ্ছ টলটলে বুদ্ধির আপন হাতে যাচাই করে নেওয়া যে জগত সেটাই একমাত্র জানবার যোগ্য।

দীপ্তি—এ আর এমন নূতন কথা কি! আজকালকার চিন্তাশীল লোক মাত্রেই এই কথা বলিয়া থাকেন।

সমী—হয়ত বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁদের বলার ভিতর এমন জোর নাই যে লোকে মুগ্ধ হইয়া শোনে। অল্ডাসের বলিবার কথার সহিত এই বলিবার জোর আছে, এমন ভঙ্গীতে বলা যে লোকে কান পাতিয়া শুনবে এবং শুনলেই মুগ্ধ হবে। আর তাইত তাঁহার প্রভাব দিন হতে দিনান্তরে এমন করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথমে মনে হইতে পারে বটে যে অল্ডাস তবে বোধ করি সংশয়বাদী, বুদ্ধিসর্ব্বস্ব। প্রতি কথায় অপ্রত্যাশিত

নিষ্ঠুর, তীক্ষ্ণ সিনিসিজ্‌মের স্রোত উপচে পড়ছে, কিন্তু তা নয়। তা' যদি হ'ত লোকে তাঁহার সত্যভাষণের দম্ভকে শ্রদ্ধা-মাত্র হয়ত করিত কিন্তু তাহাকে এমন করিয়া ভালোবাসিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। অল্ডাসের বলিবার ধরণটি বড় চমৎকার, নিরতিশয় নূতন। তাই এঁর মতকে যাহারা সকল সময়ে মানিতে পারে না, তাহারাও তাঁর কথার মোহন সুরে দু'দণ্ড মুগ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। ধরা যাক এঁর সিনিসিজ্‌ম্। সিনিসিজ্‌মের সহিত মিশেচে এসে তাঁর উচ্ছ্বসিত হাস্যরসপ্রিয়তা লঘুছন্দের বেগ। যে সিনিসিজ্‌ম্ অতিরিক্ত গভীর সুরে বলতে গেলে, নিরানন্দ ধূসর মেঘাবৃত আকাশের মত মনটাকে ঘোলাটে ভারি করিয়া তুলিত, সেই বস্তুই হাসিতে হাসিতে, খুব গভীর কথার মাঝেও এক-আধটা লঘু ক্ষিপ্রগামী তামাসার তীর বিদ্ধ হয়ে এঁর হাতে রূপ পেয়েচে অসামান্য। মনে মনে বলিতে ইচ্ছা করে ঠিক এমনটি আর কোথাও দেখি নাই।

দীপ্তি—কিন্তু আমার সেই 'আল্‌সী' কবিতার কি হইল? না হয় তোমার প্রিয়তম লেখক অল্ডাসের কথাতেই তাহার উত্তর দাও।

সমী—হাঁ তাই দেব। এবং এই দেওয়ার ভিতর থেকেই তুমি বুঝিতে পারিবে অল্ডাসের লেখায় এ যুগের লোকে তাই কেন এত আশ্রয় পেয়েচে। অল্ডাসের প্রবন্ধর বহিগুলি যে অসামান্য সে কথা তুমি জান। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পর, এত সরস করে, এত সুন্দর করে অথচ এত যুক্তির সহিত

প্রবন্ধ রচনা, অল্ডাসের ছাড়া আর খুব কম লেখকেরই বোধ করি দেখেছি। তাঁর 'On the Margin' বহির 'Accidie' প্রবন্ধখানি একটুখানি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই, আল্‌সী কবিতা পড়িয়া এত লোকের মুগ্ধ আবেশের কারণ খুঁজিয়া পাবে। অল্ডাস বলেন: এ যুগ স্বপ্নভঙ্গের যুগ। এর আগের. আগের যুগেও মানুষের কপালে যথেষ্ট নিরাশা জুটেছে, কিন্তু এমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাঙ্গীন হতাশার যুগ আগে হয় নাই। তখন লোকে কোন একটা আদর্শের জন্য প্রাণপাত করিত, সেটাইত একটা আশ্রয়। কিন্তু এখনকার লোক ক্রমশঃ দেখিতেছে after all প্রাণপাত করবারই কোন মূল্য আছে কি না? যা পাওয়ার জন্য গলা ফাটান গিয়েচে এখন পাওয়ার বেলায় তারই মোক্ষফল দেখে, গলা ভাঙার জন্যই নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে অভিসম্পাত দিতে ইচ্ছা হইতেছে। যে সব আইডিয়াকে, যাদেরকে সপ্তম স্বর্গে তোলা হইয়াছিল এখন তাদেরই হাওলাত দেখে একসঙ্গে চোখে জল মুখে হাসি দুই আসিতেছে। এতবড শূন্যতার বোঝা, এত দারুণ নিরাশার ধাক্কা সামলাইতে হইলে ক্লান্তি এবং আলস্যের ভাব আসিবেই। সেই জন্যই ত একটু বড় গোছের গদ্‌গদ কথা বলিতেও লোকে আজকাল ভয় পায়। চোখের সুমুখে হাজার হাজার প্রচেষ্টার, বড় বড় ভালো ভালো কথার সহস্রবিধ লাফালাফি এবং আস্ফালনের চরম ব্যর্থতার এত বিরাট ফর্দ্দ দাখিল দেখিয়া নিজের থেকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়: কি হইলে সমাজের ভালো হয় আর কি হইলেই

বা যারপরনাই মন্দ হয়, হৃদয়ের এসকল মাথা খোঁড়াখুঁড়ি এবং আবেগময় আকুতিকে যথাসাধ্য নিরস্ত করিয়া, মোহমুক্ত পরিষ্কার বুদ্ধির আলোতেই বুঝি অবশেষে দেখা মিলিবে আসল সত্য বস্তুটির। অল্ডাসের লেখায় বুদ্ধির এই আলো দীপ্ত। তাই তাঁহার রচনায় এ যুগ বিশেষভাবে আপন ভাষা পাইয়াছে।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য তাঁহার···

দীপ্তি কহিল বাধা দিয়া : আশ্চর্য্যের কথাটা এখন থাক কিন্তু বুদ্ধিসর্ব্বস্ব অল্ডাস্ যে কখনও সত্যের ভারকেন্দ্র হইতে এতটুকু বিচলিত হন নাই, এমন কথা আমি মনে করি না। অল্ডাস্ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা তোমাকে বলি শোন, আমি তাঁহার প্রথম বহি পড়ি 'Jesting Pilate', এবং এ বহি পড়িবার পর রাগ করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, আর তাঁহার দ্বিতীয় বহি পড়িব না। কেন যে এমন রাগ, সে খবর তুমি 'Jesting Pilate' ভালো করিয়া পড়িলেই জানিতে পারিবে।

সমী হাসিয়া কহিল : সে খবর একটু-আধটু জানি বই কি। কিন্তু তার সঙ্গে এইটুকুও জানি তোমার সে পণ তুমি একেবারে রাখিতে পার নাই। তারপর অজস্র অল্ডাসের বহি পড়িয়াছ।

দীপ্তিও হাসিয়া কহিল : হাঁ, তা পড়িয়াচি বটে। ওইখানেই ত অল্ডাসের অসহ্য শক্তির নমুনা। তাঁহার খরধার মতামতে রাগ করিয়াও দু'দণ্ড বসিয়া থাকিবার যো নাই। এমনই তাঁহার লেখার আকর্ষণী শক্তি যে অনেক স্থানে মতামত না মিলিলেও, না পড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব এত বড় মনের জোর আমার নাই।

সমী—না থাকাই ভালো। মনের জোরকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়াও সংসারে অনেক সময় ভালো বস্তু পাওয়া গিয়াচে। কিন্তু অল্ডাসের লেখার আশ্চর্য্য সেই ক্ষমতার কথাই আমি তোমাকে বলিতে যাইতেছিলাম। তাঁহার বুদ্ধির ভারের চেয়ে ধার বেশী। তাঁর সত্যকে প্রকাশ করিয়া দেখাইবার, আনসেন্টিমেণ্টাল ঈষৎ ব্যঙ্গময় হাসিহাসি ভঙ্গী, যারপরনাই বড় বড় কথাকেও কী চমৎকার দু'কথায় মীমাংসা করিয়া দেয়। ধর, আজকালকার ওই যে একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠিয়াছে: আর্টের জন্যই আর্ট। লেখার রীতি বড় না নীতি বড়? ইত্যাদি ইত্যাদি ...এ সকল কথা লইয়া বিশ পাতার প্রবন্ধ লেখা যায় এবং তাহারও পরে হয়ত অবশেষে দেখা যায় কথাটা কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই, যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু অল্ডাস্ সে ধার দিয়াও যান নাই। তিনি জানেন কাল্চার বস্তুটা কমল-হীরার মত; তাহার বস্তু অংশের চেয়ে দ্যুতিটাই বড় জিনিষ। তাই তাঁহার দীপ্তিময়, সংক্ষিপ্তসার কথাবার্ত্তার মাঝে মাঝে এই সকল অমীমাংসিত তর্কের উপর কী স্বচ্ছ আলোই না ফেলিয়াছেন!

দীপ্তি কহিল: অল্ডাসের প্রতি অসহনীয় ভালোবাসায় তোমার কথাবার্ত্তার সুর যে ক্রমেই অস্পষ্ট মেলোড্রামার দিকে ঝুঁকিতেছে, ভালো করিয়া নমুনা দিয়া দেখাইয়া দাওনা তাঁহার কমল-হীরার ঝক্ঝকানিটা কোন্ দরের।

সমী—ধর, সেক্সপীয়রের কথা লইয়া ম্যাজিক বানাইবার বিষয়ে যেখানে তিনি বলিতেছেন : 'What is it that makes the two words 'defunctive music' as moving as the dead march out of the Eroica and the close of Coriblan ?···Why should it be somehow more profoundly comic to call 'Tullia's ape a marmosite' than to write a whole plays of Congreve ?' (Those Barren Leaves) আর্টের জন্যই আর্ট এবং আজকালকার এই অধোগতির দিনে বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়া লেথকেরা কেবল মাত্র কথার ফেনা দিয়া কী পর্য্যন্ত অসার বুদ্বুদ্ তৈয়ারী করিতেছে, এ সকল প্রচলিত মারামারির ভিতরে তিনি ঢোকেন নাই কিন্তু আপনার শক্তিমান ভঙ্গীতে জানাইয়া দিলেন : (এবং অল্ডাস্ ছাড়া এত সংক্ষেপে এমন জোরালো করিয়া কে জানাইতে পারিত ?) ভাষা প্রয়োগের এই চরম নৈপুণ্য, পরিপূর্ণ বাণীর এই মূর্ত্তি, ইহারই ভিতর অপার স্তব্ধতায় নিরসন হইয়াছে সকল কালের সকল তর্কের উত্তাপ : ভাব বড় না ভাষা বড় ? রচনারীতি বড় না বিষয়বস্তু বড়। এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তর কথা অবশ্য তিনি বলিয়াছেন নানা প্রসঙ্গে। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'Antic Hay'-তে বলিয়াছেন আরও বিশদ করিয়া। কিন্তু এই 'ফর্ম্মের' কথা তিনি সব চেয়ে জোরালো, মিষ্টি এবং ইঙ্গিতপূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন—আমার মনে হয় ওঁর গল্পের বই 'Brief Candles'-এর 'Chawdron' নামে গল্পটিতে।

সমী ও দীপ্তি

দুই বন্ধুতে সকাল বেলাকার ব্রেকফাষ্ট টেবিলে বসিয়া গল্প করিতেছে। সেদিনকার 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় বাহির হইয়াছে— একজন বড়দরের financier পাণ্ডা Chawdron'-এর মৃত্যু-সংবাদ।

কথায় কথায় তাহার প্রসঙ্গে কথা উঠিল। এক বন্ধু Chawdron-এর সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল। সে তাহার জীবনের গুটিকতক প্রেমোপাখ্যানের গল্প বলিতে সুরু করিল। গল্প যখন শেষ হয় তখন সকাল বেলাকার খাবার সময় বহিয়া গিয়া দুপুরের আহারের সময়ে গড়াইয়াছে। অবশেষে কথক বন্ধু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল: সিগ্রেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়া আমার সারা সকালটা উড়িয়া গেল। তোমার পক্ষে ও গল্প নূতন এবং তুমি শ্রোতা কিন্তু আমার ত বহুদিনের জানা গল্প। তবু সেই জানা বস্তুকেই কথার উপর কথা দিয়া মূর্ত্তি দিতে ব্যয় করিলাম আমার সারা সকাল। অন্য বন্ধুটি এ অনুযোগের উত্তরে বলে: 'But for Shakespeare so was the story of Othello even before he started to write it.'

বন্ধুর মুখ দিয়ে বলান এই ছোট্ট উক্তিটুকুর মাঝেই প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে অনেক কথা। সেকথা বড় বড় প্রবন্ধে গলদঘর্ম্ম হইয়া অনেকে অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অল্ডাসের মত করিয়া বলিতে পারিয়াছে খুব কম লোকে। কারণ অল্ডাসের বলিবার শক্তি এবং এই শক্তিই তোমাকে তোমার পণ রাখিতে দেয় নাই।

দীপ্তি একমনে শুনিতেছিল, কহিল : ভয়ানক ঠিক কথা। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায়-অভিশাপ', 'কর্ণ-কুন্তি সংবাদ' এসকলের বিষয় বস্তুর সংবাদ ত তাঁহার লেখার পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল কিন্তু···হাঁ অল্ডাসও তাই বলেন— বাণী দিতে পারিলে পৃথিবীর মত পুরাতন বস্তুতেও নবজীবনের রস-সঞ্চার করা যায়।

সমী খুসী হইয়া কহিল : তুমি দেখিও অল্ডাস্‌কে শ্রদ্ধার সহিত যত পড়িবে ততই দেখিবে কেন এযুগের ছেলেমেয়ে তাঁহাকে আশ্চর্য্য রকমের ভালোবাসে। এমন ভালোবাসা প্রায়ই ঘটে না। কারণ অল্ডাসের শিল্পী মনের ক্ষমতাকে সপ্রশংসচিত্তে তারিফ করা, প্রকাশ-ভঙ্গীকে মুগ্ধ হইয়া অভিনন্দন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহিত মতামতও বড় বেশী মেলে। ভালোবাসার সহিত মতে মেলা প্রায়ই একত্রে পাওয়া যায় না।

দীপ্তি কহিল : সমস্তই মানিলাম, কিন্তু অল্ডাসের বিরুদ্ধে আমি যে কথাটা বলিতে সুরু করিয়াছিলাম তাহা শোন। কেন আমার 'Jesting Pilate' পড়িয়া রাগ হইয়াছিল, কেনই বা মনে হইয়াছিল বুদ্ধিবাদী অল্ডাস্ এক এক স্থানে ভাবের সত্যকে উড়াইয়া দিয়া, অতিরিক্ত মাত্রায় সন্দিগ্ধমনা খুঁতখুঁতে যুক্তিকে প্রশ্রয় দিয়াছেন।

সমী মৃদু হাসিয়া কহিল : তুমি যে কারণে রাগ করিয়াছিলে, তাহার স্ফুলিঙ্গ কখন কখন একটু-আধটু আমার কাছেও আসিয়া পড়ে বই কি! এক এক সময় অল্ডাসের নিছক

বুদ্ধিবাদের উপর দস্তুর মত রাগ হয়। যেমন ধর নিজের জবানীতে তিনি 'Those Barren Leaves' নামে উপন্যাসের Francis Chelifer-কে দিয়া বলাইতেছেন :

ছেলেবেলাকার যুক্তি নিরস্ত, বেপরোয়া; হৃদয়াবেশে লোকে সেন্টিমেণ্টাল সংসর্গ হইতে কত কুশিক্ষাই না পায়। সূর্য্যাস্তের আভাময় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মাঝে শৈশবকালে বাবার মুখ হইতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই সব লাইন 'A sense sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of setting suns'···আবৃত্তি হইতে শুনিয়া তাঁহার যে অপরিণত শিশু মন বিস্ময়ে, রহস্যে, শ্রদ্ধায় পুলকিত হইত, বুদ্ধির যথাযথ উন্মেষের পর আজ তাহাকেই মনে হয় কী কুশ্রী···আর কেন যে এতদিন বৃথাই গেল এই ভুল আনন্দে ; সময়ের সেই দীর্ঘতাও আক্ষেপময়। 'It took me a long time to discover that they were as meaningless as so many hiccoughs. Such is the nefarious influence of early training'—(Those Barren Leaves)

দীপ্তি উত্তেজিত হইয়া কহিল : আচ্ছা তুমিই বল এমন কথা শুনিয়া বলিতে কি ইচ্ছে করে না যে, অসীম তীক্ষ্ণবুদ্ধির গর্ব্বে দীপ্ত অল্ডাসের চিত্তের কোন প্রচ্ছন্ন কোণে যদি আজিও শৈশব-বেলাকার সেই রহস্যমুগ্ধ শিশুটি লুকাইয়া থাকিত, তবে সে'ও আমাদের মন কাড়িত। বুদ্ধির প্রচণ্ড লীলায় আমরা তাহাকে কিছুতেই ভাসিয়া যাইতে দিতাম না।

সমী হাসিয়া কহিল : দাঁড়াও তোমাকে আরও কিছু উত্তেজিত করি, তারপর ও কথার জবাব দিব। তারপরে ধর, যেখানে তিনি লিখিয়াছেন Jesting Pilate-এ…'and to one fresh from India and Indian spirituality, Indian dirt and religion, Ford seems a greater man than Buddha.'……দীপ্তি হাসিয়া কহিল : সত্য নয়, কখনো সত্য নয়—ও কথাটা ওঁর তামাসা।

সমী গম্ভীর মুখে কহিল : তামাসা! তা হবে। তবে কিনা এমন তামাসা যে শুনিলেই বলিতে ইচ্ছে করে just like Aldous, indeed! তারপরে আরও আছে ধর, Proper Studies-এ যেখানে তিনি লিখিতেছেন……'Incense, vestments and banners—nothing was lacking which might help to produce in the minds of worshippers that heavily charged devotional feeling which the Indians call Bhakti.' যেন বড় তামাসার কথা। কেহ যদি ভক্তি করিয়া সুখ পায় সে ইণ্ডিয়ানস্ নাও হইতে পারে।

দীপ্তি চোখমুখ লাল করিয়া কহিল : তবেই দেখ সত্যকথা কহিবার স্পর্দ্ধায় তিনিও কখনো কখনো সত্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং বিনয় রাখিতে পারেন নাই।

সমী কহিল : কিন্তু অমন সমালোচনা শক্তিমানকেই সাজে। অল্ডাস ছাড়া নিজের স্বজাতির প্রতিও, বোম্বাইয়ের সহরতলীর রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে এমন কথা কেহ

বলিতে পারিত না যে : 'এই সকল পথচারী সাধারণের চোখে, নিজের কাল্‌চার, স্বাতন্ত্র্য এবং উদ্ধত ধনগর্ব্ব লইয়া এখন আমি একান্ত অনায়াসে নিরাপদে পদচারণা করিতেছি। কিন্তু এদেশীয়দের কাছে আমাদের প্রতিপত্তি অনেকটা নোটের টাকার মত। প্রচলিত প্রথামত সেই কাগজ খণ্ডের একটা বিশেষ মূল্য ছাপমারা আছে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে, সেইটুকু বিশ্বাসের জোরেই আজিও আমরা টিঁকিয়া আছি। যে মুহূর্ত্তে অনেকে একত্রে অবিশ্বাস করিবে—আমাদের মূল্যহীনতাকে আমরা যে কাগজকে বাজারে দশ পাউণ্ডের নোট বলিয়া চালাইতে চাই, তাহার দাম 'টাইমস্' পত্রিকা হইতে এক আঁচড়ে ছেঁড়া এক টুক্‌রো বিজ্ঞাপনের পাতার মতই মূল্যহীন—এই কথাটা যেদিন তাহারা অসংশয়ে মানিয়া লইতে পারিবে সেই দিনই আমরা এখানে কল্কে পাইব না। এ কথাটামাত্র একযোগে অনেক লোককে এককালীন বিশ্বাস করাইতে সক্ষম হয় নাই বলিয়াই নন-কো-অপারেশন বারংবার ব্যর্থ হইয়াছে।

যে আপন স্বজাতিকেও এমন করিয়া সমালোচনা করিতে পারে, তাহার সমালোচনায় যদি মাঝে মাঝে অত্যুক্তি আসিয়া ঠেকে সহ্য করিতে বাধে না। তাহা ছাড়া অল্ডাসের অপূর্ব্ব ভ্রমণের বইগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে কোন দেশ-বিশেষকে কটাক্ষ করা আদপেই তাঁহার ধাতে নাই। তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধির ছটায় মাঝে মাঝে চোখ বিভ্রান্ত হইয়া গেলেও অবশেষে সমস্ত হৃদয় দিয়া মানিতে হয় যে এঁর মন কোন কিছুতেই

আবদ্ধ নয়, কোন সত্যকেই চরম বলিয়া মানিতে চায় না। সে চিরসামঞ্জস্যশীল, চিরপথিক মন জীবনের পথ-রেখায় দুই চক্ষু খোলা রাখিয়া আপন ভাবে, আপন স্বাধীন সত্তায়, আপন মনের বিশেষত্ব সকল বস্তুকে দেখে। Jesting Pilate-এর শেষ পাতায় তাই তিনি স্বীকার করিয়াছেন—প্রায় সমস্ত পৃথিবী নিজের চোখে ঘুরিয়া দেখিবার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: পথিক যে, সে কোন বিশেষ জাতিগত দেশগত জীবন-যাত্রার আদর্শ মানে না কিংবা কোন এক শ্রেণীর ষ্টাণ্ডার্ডের প্রতিই বিশেষ পক্ষপাত দেখায় না। দেশে দেশে কত বিভিন্ন সভ্যতা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘুরিয়া সে তুলনা করিয়া মিলাইয়া দেখে, হয়ত বা কোথাও 'The fundamental standard is distorted by an excessive emphasising of hierarchic and aristocratic principles; in another by an excess of democracy ?···' হয়ত বা কোথাও আধ্যাত্মিকতা নিয়া মাতামাতি, কোথাও materialism-এর নীরেট স্থূল ছায়ায় জীবনের এই সকল দিকের মূল্যই একেবারে অর্থহীন করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা। কিন্তু যে চিরপথিক সে কোথাও থামে না; সে এসমস্ত হইতেই সত্যকে বাছিয়া লইবার চেষ্টা করে, এমন আদর্শ লইতে চায়—'A standard of values that shall be as timeless, as uncontingent on circumstances, as nearly absolute, as he can make them—' (Jesting Pilate)

সমী একটু থামিয়া আবার বলিয়া চলিল : আর অল্ডাস সমস্ত পৃথিবীর পথিক। পথিক কথাটা লক্ষ্য করিও। হাঁ তিনি পথিক—ট্যুরিষ্ট নহেন, তাই তাঁহার ভ্রমণের বইগুলি যে কোন সাহিত্যের সম্পদ হইতে পারে। সকল·দেশের প্রথা, সংস্কার, আদর্শ বোধকে যে শুভবুদ্ধি এমন করিয়া মিলাইয়া লইয়া আপন অন্তরের প্রেরণায় তাহাদের ভিতর হইতে সত্যকে গড়িয়া তুলিতে পারে—সেই আসল পথিক। তাই অনেক সময় অল্ডাসের উপন্যাসের চাইতে আমার তাঁহার ভ্রমণের বইগুলি আরও ভালো লাগে। এখন বোধ করি বুঝিতে পারিতেছ তাঁহার চিন্তার ধারাটা কোন দিকে।

দীপ্তি কহিল : হাঁ, আর তাইত সেই চিন্তা আমাদের মনকে এমন বিস্ময়াবিষ্ট করে, সে চিন্তা স্বাধীন তেজে, বুদ্ধির আলোকে, মননশক্তির অসামান্যতায় যে কোন জাতির গৌরবের বস্তু।

সমী কহিল : আর কি বিনয়, এত জ্ঞানী এত পণ্ডিত··· সহসা দীপ্তির দিকে চাহিয়া সে বলিল : অল্ডাস কতগুলি ভাষা জানেন সে খবর রাখ কি ?

দীপ্তি হাসিয়া একটা হাত তুলিয়া কহিল : থাম, ভাষাতত্ত্ব-বিদের ব্যাখ্যায় আর প্রয়োজন নাই। তিনি ক'শো ভাষা জানেন সে প্রশ্ন অবান্তর। এবং অল্ডাসও তাহা জানেন যে বিদ্যার ওজনটা ভারমাত্র তাহার দীপ্তিই আসল। তাই তাঁহার মনটা এই দীপ্তিতে ঝলমল। তাইত পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার মনটা যেন কমলহীরা, যেদিকেই ঘোরাও দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

সমী কহিল : অনেক জানেন বলিয়াই ত এত বিনয়। সে বিনয় আবার গুরুগম্ভীর বিনয় নয়। হাস্যরসময় লঘু, চটুল বিনয়। যেন বিনয় দিয়া নিজের মানের পাহাড়কে আরও বাড়াইতেছি এমন ভ্রান্তির লেশমাত্র অবকাশ না ঘটে। অল্ডাসের উপন্যাসে প্রায়শঃই এমন একটা করিয়া চরিত্র থাকে তাহাদের মুখের কথা তাঁহার নিজেরই জবানী। এইরূপে জবানীর মুখে তিনি বলিয়াছেন : 'I am only a competent second rate helma player'.

(Those Barren Leaves)

দীপ্তি কহিল : ওটা অতি বিনয়।

সমী তাহার কথায় মনোযোগ না করিয়া আপন মনে হাসিয়া কহিল : আর কী চমৎকার বিদ্রূপ-ভরা বিনয়! আর এক স্থানে এক সুন্দরী তরুণীর সহিত গল্পকালে এমনই বলিতেছেন : 'What a tremendous hurry she is in to tell me all about herself. If she were older or uglier, what an intolerable egotism it would be! As intolerable as mine would be if I happened to be less intelligent.' কেমন সুন্দর বিনয় বলত? একেবারে যাহাকে বলে নির্ভেজাল বিনয়। কেবল একটু মাথা নামাইয়া মুখে তাইত, তাইত করা নয়।

দীপ্তি কহিল : আর তিনি যে এযুগের লেখক তাহার মস্ত বড় প্রমাণ পাইলাম তাঁহার উপন্যাস 'The Brave New

World' পড়িয়া। কী দারুণ বই! বর্ত্তমান যুগের ফোর্ডিজম্‌কে এমন মস্ত বড় তামাসা, এমন গভীর, উদার, করুণার্দ্র ঠাট্টা বোধ করি আর কেহ করিতে পারে না। এযুগের কেবল সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে যতদূর পারা যায় নিজের নিজের এলাকায় বন্দী করিবার চেষ্টার মাঝে যত বিকার, যত গলদ, যত প্রলাপ, যত অন্তর্লীন হাস্যাস্পদতা আছে সমস্তই তিনি পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন। এ বইখানা ফোর্ডিজম্‌কে একটা প্রচণ্ড ঠাট্টা। আর তা অল্ডাসের ঠাট্টা।

সমী কহিল: আমার নিরতিশয় লোভ হইতেছে, Brave New World-এর কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে দেখাইয়া দিই, বর্ত্তমান যুগের গলদ কেমন করিয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে নাই।

দীপ্তি কহিল: দেখাইবে, আচ্ছা দেখাও। কিন্তু আমার ভয় হয় বাংলা কথোপকথনের মাঝে অধিক মাত্রায় ইংরাজী আসা সৌন্দর্য্য এবং রসবোধের দিক হইতে নিরাপদ কিনা?

সমী—হোক ইংরাজী। তাহা অল্ডাসের ইংরাজী, তাই ইহার রসেরও সীমা নাই। আজকালকার সভ্যতার শেষ কথা এই যে এমন একটা ধাক্কা তাহার চাই যাহা—Make them lose their faith in happiness as the sovereign good and take to beliving, instead, that the goal was somewhere beyond, somewhat outside the present human sphere; that the purpose of life was not

the maintenance of well-being, but some intensification and refining of consciousness, some enlargement of knowledge ? (Brave New World)

তাহা হইলে দেখ, অল্ডাসকে একেবারে বুদ্ধিবাদী বলিয়া বরখাস্ত করিতে পার না। তাঁহাকেও মাঝে মাঝে এমন টার্মস্ ব্যবহার করিতে হয়!···somewhere beyond, somewhat out side'······

দীপ্তি হাসিয়া ফেলিয়া কহিল: নিউটনও ত্রিশ বছরের পর মিষ্টিক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন সেকথা জানত? তাহার দিকে চাহিয়া সমীও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল: যে কারণে কিছু আগের যুগে আলস্য ছিল অপরাধ, (ennui) এন্যুই ছিল একটা মারাত্মক দোষ কিন্তু এখন আমরা 'আল্সী' কবিতা পড়িয়া চোখ মুদিয়া মনকে অবাধে আলস্যের নেশায় আচ্ছন্ন হইতে দিই, অনেকটা সেই কারণেই আজকালকার বড় বড় প্রতিভাকেও অবশেষে মিষ্টিক্ হইতে হইতেছে।

দীপ্তি কহিল: আচ্ছা থাক সে তথ্য। অল্ডাসের পাণ্ডিত্য, অল্ডাসের ফিলজফি, অল্ডাসের বহুমুখী চিন্তাধারা এ সকল গেল, এইবার বল দেখি আর্টিষ্ট অল্ডাসের কথা। দেখি তোমাকে কোথাও কিছুমাত্র হার মানাইতে পারি কি না। মনে কি হয় না যে এখানে তাঁহার কিছু অসম্পূর্ণতা আছে, তাই তাঁহার উপন্যাস পড়িয়া মতামত চটপট মিলিয়া যায়, চিন্তা পরিতৃপ্ত হয়, মন মাথা নাড়িয়া খুসী হইয়া বলে—অল্ডাস্ পড়া

একটা এ্যডুকেশন বটে। অথচ রসবোধ তেমন গভীররূপে তৃপ্ত হয় কই?

সমী—যে সব সমালোচকরা অল্ডাসকে দেখিতে পারে না তাহারা বলে বটে যে অল্ডাস্ আসলে প্রবন্ধ লেখক, এবং মাঝে মাঝে লেখেন তিনি দীর্ঘ এক এক প্রবন্ধ এবং তাহারই নাম দেন উপন্যাস।

দীপ্তি—কথাটার মাঝে কি সামান্য ভগ্নাংশের সত্যও নাই?

সমী তাহার কথার উত্তর না দিয়া কহিল: তাহারা বোধ করি আরও বলে, অল্ডাস্ তাহার উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রের সব কথা নিজের মুখে বলিয়া দেন, তাহাদের নিজেদের কথা নিজেদের ভাবে বলিবার অবকাশ দেন কই? তাই তাঁহার চরিত্রগুলি এক একটা জীবন্ত সৃষ্টি হইয়া ওঠে নাই।

দীপ্তি একটু ভাবিয়া কহিল: তাই বটে। এবং আমি যে অল্ডাস্‌কে একেবারে দেখিতে পারি না, এমন অপবাদ বোধ করি আমাকে তুমি দিবে না। অথচ আমারও এইরূপই মনে হয়। গলস্‌ওয়ার্দ্দি, রোঁলা ইঁহাদের লেখা উপন্যাস পড়িবার পরে, বিশেষ করিয়া লেখকের কথাই মনে পড়িতে থাকে না। লেখককে ছাপাইয়া তাঁহার সৃষ্ট এক একটা চরিত্র সজীব হইয়া অন্তরে আসন নেয়। বই পড়া শেষ হইয়া গেলেও তাহাদের সহিত মন জানাজানি ফুরায় না। গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির কথা হয়ত স্মরণ পথে আসে না, কিন্তু 'ফরসাইথ সাগা'র আইরিনাকে কত মোহময় সূর্য্যাস্তের সময়ে, কত স্নিগ্ধ সকালবেলাকার বাতাসে মনে মনে

ভাবিয়াছি। শিল্পী তাঁহার উপন্যাসের এক একটা চরিত্রকে এমন করিয়া ফুটাইয়াছেন যে লেখককে সম্পূর্ণ পিছনে ফেলিয়া তাহাদের স্বতন্ত্র এক একটা জীবন সুরু হইয়া গেছে। অন্ডাসের উপন্যাস পড়িয়া তাহা হয় না। মুগ্ধ মনের সমস্ত প্রশংসা একা অন্ডাস্ই পান; তাই ত কী চিন্তাশীলতা! কী আশ্চর্য্য স্বচ্ছ দৃষ্টি! কিন্তু অন্ডাসের রচিত কোন মানব বা মানবীকে আমরা সমস্ত মনখানি হাতে তুলিয়া দিতে পারি না। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে এ অসাপত্ন্য প্রশংসায় অন্ডাসের কোন গৌরব নাই! প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে প্রিয় হৃদয়ের মুগ্ধতার অঞ্জন মাখাইয়া না দেখিলে সম্পূর্ণ করিয়া দেখা হয় না; তেমনি একা লেখককে মুগ্ধ করপুটের সমস্ত অঞ্জলি না ঢালিয়া দিয়া, তাঁহার সৃষ্ট জগতে ঢুকিয়া এ মুগ্ধতার ভার দিতে যদি পারি তাঁহার মানস-লোকের কোন প্রিয় বা প্রিয়তমাকে তবে সেটাই তাঁর চরম পুরস্কার।

সমী—না হয় তোমার কথাটা মানাই গেল কিন্তু দেখি আমাদের বেশীর ভাগ লোকের প্রবণতা, সমালোচনা করিতে গেলেই সেটা হইয়া পড়িবে তুলনামূলক সমালোচনা। অমুক লেখকের লেখা এমন না হইয়া অমন হইল কেন? কেন আগাগোড়া তাঁহার রচনা-রীতি এবং পদ্ধতি অমুকের সহিত হুবহু মিলিয়া গেল না? কর এখন তাহার কৈফিয়ৎ তলব। যেমন এইমাত্র তুমি মুখের ডগায় তাড়াতাড়ি রোঁলা আর গলসওয়ার্দ্দির নাম করিয়া এবং তাঁহাদের উপন্যাসের

প্রমাণ পাড়িয়া স্বস্তি পাইলে। কিন্তু এমন প্রবৃত্তি ত সত্য নয়। অল্ডাস্‌কে তাঁহার আপন নিয়ম অনুসারে বিচার কর। তাহা যদি না করিতে পার সেটা তাঁহার লেখার প্রতি অবিচার এবং আপন বুদ্ধিবৃত্তিরও অপচার। যদি বল রবীন্দ্রনাথ কেন শরৎচন্দ্রের রচনা-রীতি অনুসরণ করেন নাই, কিংবা শরৎচন্দ্র কেন রবীন্দ্রনাথের মত হইলেন না, কথাটা কেমন অত্যদ্ভুত !

দীপ্তি হাসিয়া কহিল: তোমার অল্ডাস্-প্রীতির বাড়াবাড়ি যথেষ্ট জানা আছে আমার, তাই তোমার কথাকে দয়া করিয়া তর্কের তীক্ষ্নবাণে টুক্‌রা টুক্‌রা করিলাম না। কিন্তু এমন কথা তুমি কিরূপে বলিলে? অল্ডাস স্বকীয় প্রতিভার রসে দেদীপ্যমান, তাঁকে অমন অনুকরণের কথা কেহ বলিতে পারে না। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আলাদা, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁহারা আপনভাবে রস-জগত সৃষ্টি করিয়াছেন। অল্ডাসের উপন্যাসে মনের আর-সকল-দিক তৃপ্ত হয়, কিন্তু রসবোধ তৃপ্ত হয় না; এই কথাটাই মাত্র তোমাকে আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম।

সমী—রসবোধ তুমি কি অর্থে প্রয়োগ করিতেছ সেটা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার।

দীপ্তি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল: ধর, অল্ডাসের উপন্যাসে রসবোধের সর্ব্বপ্রথম অসম্পূর্ণতা যাহা চোখে পড়ে তাহা এই যে, প্রেম সম্বন্ধের বিষয়ে তাঁহার সুর এত ভাসাভাসা কেন?

প্রেমে যেন তিনি যথেষ্ট সন্ধিহান। কেবল উপরের পর্দাগুলা লইয়াই এখানে তিনি নাড়াচাড়া করিতেছেন, মেয়েদের সম্বন্ধে ইষৎ সিনিসিজি্‌ম, হাসি হাসি বিচ্ছিন্নতা, তাহাদের করুণাময়ী ব্যগ্র বহুপাশ হইতে যতদূর সম্ভব ছাড়া পাওয়া যায় তাহারই আপ্রাণ চেষ্টা। সমস্তটাই যেন ছাড়া ছাড়া গোছের। তাই শ্রীকান্ত, ঘরে-বাইরে, জনক্রিষ্টোফার, ফরসাইথ সাগা পড়িয়া যে আনন্দ-বেদনার লীলায় মন মথিত হইয়া উঠে, চক্ষুপ্রান্ত সজল হইয়া আসে—যে গভীর ভাবময় জগতে মন প্রবেশ করে, অল্ডাসের সৃষ্টিতে সে প্রবেশ পথ নাই। কিন্তু নাই কেন? আর এখানেই ত তাঁহার রসসৃষ্টির অক্ষমতা।

সমী কহিল : কিন্তু আর্য্যা, চক্ষুপল্লব সিক্ত হওয়াকে এযুগের নর-নারী বর্ব্বরতা মনে করে। এবং এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে, তোমার অভিযোগের উত্তর দিতে বসিলে যে অল্ডাসের বয়স এখন মোটে আটত্রিশ বছর, এবং গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স বোধকরি মোটে আঠার ছিল।

দীপ্তি কহিল : কি যে হেঁয়ালির মত কথা বল! কিন্তু তাহাতে কি?

সমী অন্যদিকে চাহিয়া আপন কথার ভাবে বলিয়া চলিল : এবং গত যুদ্ধেই হইতেছে সেই নিশানা যে-নিশানা হইতে আরম্ভ হইয়াছে বিশেষ করিয়া এ যুগ।

দীপ্তি অধীর হইয়া কহিল : ও কথাটা ত একশবার বলিয়াছ যে অল্ডাস এ যুগের লেখক।

সমী তথাপি তাহার অধীরতার উত্তর না দিয়া কহিতে লাগিল: এবং রেঁালা, রবীন্দ্রনাথ, গলস্‌ওয়ার্দ্দি তাঁহাদের জীবন এযুগের কোঠায় পড়ে না। অর্থাৎ এযুগের অবিশ্বাসময়, বেদনাময়, হতাশাময় যুগসূচনার ঢের পূর্ব্বেই তাঁহাদের চরিত্রের মোটামুটি গঠন এবং রেখাগুলা স্পষ্ট হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অল্ডাসের তাহা হয় নাই। আর এই সংবাদটার ভিতরই রহিয়াছে তাঁর লেখার মূল কথাটা।

ধর, সেদিন রেঁালার সহিত দিলীপকুমারের এক কথোপ-কথন তোমাকে পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। পড়িতেছিলাম: টুর্গেনিভের প্রসঙ্গ ওঠায় রেঁালা খুসী হইয়া বলিতেছেন: হাঁ আর্টিষ্ট ছিল বটে টুর্গেনিভ। দরদী আর্টিষ্ট। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'Fathers and Sons' উপন্যাসের নায়ক Bazarov-কে মারিয়া ফেলিবার সময় তিনি যথেষ্ট অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। আর হে বিংশ শতাব্দীর নারী, তুমি এ খবর শুনিয়া, অঞ্চলপ্রান্তের আড়ালে অতি কষ্টে হাস্য নিরোধ করিয়া বলিয়াছিলে: তিনি কাঁদিয়াছিলেন? But how obscene! আর যদি কাঁদিয়া ভাসাইবেন তবে লেখক হইয়াছিলেন কেন?

দীপ্তি লজ্জা পাইয়া কহিল: হাঁ বলিয়াছিলাম। আমার যথার্থ মত যা তাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেই বা কি?

সমী—আমি মনে করি তোমার মত এযুগের অনেক নর-নারীর প্রতিনিধি-মত।

দীপ্তি—তুমি আমাকে বড্ড বাড়াও।

সমী হাসিয়া কহিল: হয়ত সেটা আমার অপরাধ। কিন্তু তাইত বলিতেছিলাম দেবী, পল্লবপ্রান্ত সজল হইয়া আসা কথায় কথায়, সে মোহে পড়িতে এ যুগের ছেলেমেয়েরা দস্তুর মত লজ্জা বোধ করে। এ যুগের typical লক্ষণ কান্না চাপা।

দীপ্তি—কান্না চাপা!

সমী—তাই বই কি, কারণ একেবারে কাঁদিব না নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাছে এতবড় ছাড়পত্র পায় কোন্ যুগের নর-নারীরও এত সাধ্য নাই। তাই কান্না পায় কিন্তু চাপিতে হয়। ভালো-বাসার তৃষ্ণায় আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসে আগের দিনের মতনই কিন্তু প্রাণপণে তাহাকে চাপা দিতে হয়। অবিশ্বাসের আবরণে ঢাকা দিতে প্রবৃত্তি হয়। এযুগের মনোভাবটা, কবির ভাষায় তর্জ্জমা করিলে অনেকটা এইরূপ দাঁড়ায়:—

'গভীরস্বরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই,
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি তাই
আপন ব্যথাটাই।'

দীপ্তি—তুমি কি মনে কর এযুগের এই প্রেম-অবিশ্বাসের ফলেই, অন্ত্যাসের সৃষ্টিতে প্রেমের গভীরতর ব্যঞ্জনা রূপ নিল না, অনেক অস্ফুট সুকুমার কাকলী স্পষ্ট ভাষা পেলনা!

সমী—অনেকটা তাই মনে করি। তাঁর মন, তাঁর অভীপ্সা, তাঁর চিন্তাধারা এই যুগের তালে আবর্ত্তিত হয়েচে, বোধ করি সেই জন্যই তাঁহার সৃষ্ট প্রেম-সম্বন্ধের মাঝে এমন প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে শুনিলাম না :

'ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম !'

তাই প্রেমের জন্য দুঃসহ ত্যাগ, হৃদয়ের কোন অন্ধ, অব্যক্ত একমুখী আকূতি দেখিবামাত্র ফুটিয়া ওঠে তাঁহার মুখে সেই চির পরিচিত, মিষ্ট রঙ্গপ্রিয় হাসি। তাই নর-নারীর প্রেমরচনায় তাঁহার সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন সর্ব্বদাই এড়াইয়া যাইবার ব্যগ্রতা, কিম্বা 'হাল্কা হরষ, তুচ্ছ ব্যথার' উপরের পর্দ্দাগুলোতেই কাজ শেষ করা।

দীপ্তি—কিন্তু তুমি যতই বলো, প্রতিভা দেশকালের অতীত। কোন এক বিশেষ যুগের প্রভাব হয়ত তাহার উপর পড়ে, কিন্তু প্রতিভার আপন তেজের মাঝেই সেই প্রভাবকে কাটাইয়া উঠিবার শক্তি আছে।

সমী অন্যমনস্ক হইয়া কহিল : আমারও এক এক সময় তাই মনে হয়, অল্ডাসের বয়স তরুণ ইহার মধ্যেই বোধকরি তাঁহার কাছে তাঁহার প্রতিভার চরম স্ফুরণ আশা করা যায় না।

বিশেষ করিয়া যখন দেখি, কোন কোন গল্পে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে অল্ডাসের সদা-জাগ্রত বুদ্ধির জগতের একাংশের পর্দ্দা কখন আপনা হতেই উঠিয়া গিয়াছে, এমন একটা আলো আসিয়া পড়িয়াছে, যাহা দরদ না থাকিলে কোন হৃদয় হইতেই প্রতিফলিত হইতে পারে না তখন মনে হয় অল্ডাসের উপন্যাসে রসবোধের অসম্পূর্ণতা হয়ত শীঘ্রই অন্যপথ ধরিবে, এবং তখন আমরা তাঁহার সৃষ্টিতে সেই সুরটি খুঁজিয়া পাইব, যাহার অভাবে এখন সমস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর রসস্রষ্টার আসন দিতে কোথায় যেন আমাদের একটু বাধিতেছে। যেমন ধর, অল্ডাসের 'Two or Three Graces' নামের গল্পটি। রসসৃষ্টির দিক হইতে তাঁহার এই গল্পখানি আমার সকলের চেয়ে ভালো লাগিয়াছে। ইহাতে তিনি দু'টি একান্ত সাধারণ, অসহ্য স্থূলরুচি এবং প্রকৃতির স্ত্রীপুরুষের চিত্র আঁকিয়াছেন, পেড্‌লি আর গ্রেস। সমস্তই ঠিকঠাক আছে, সেই অল্ডাসের চিরপরিচিত অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত মনোবিশ্লেষণ, নিখুঁত নির্ভেজাল খুঁটিনাটির বর্ণনা; কিন্তু অবশেষে পেড্‌লির স্ত্রী গ্রেস যখন তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তখন সেই নীরেট, নির্ব্বুদ্ধি পেড্‌লির জীবনেও বেদনার আকস্মিক বিদীর্ণতায় যে দৈবী মুহূর্ত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার সঙ্গে এতদিন এতবৎসর একত্রে ঘর করিয়া আসা গেল—তাহাকে একটি নিমিষের জন্যও কোনদিন চিনিতে পারে নাই, পেড্‌লির সেই দুঃসহ আবিষ্কারের হতবুদ্ধিতা, অন্যকে বলার ছলে যেন নিজেকেই বারংবার প্রশ্ন করা 'But I never imagined.

How could I imagine ?···How could I ? এই সমস্ত স্থানে অল্ডাস এমন দরদের সহিত হৃদয়ের ভাষাকে ফুটাইয়াছেন, যে সকল মুহূর্তের সংবাদ পেড্‌লির কাছেও হয়ত সম্পূর্ণ ভাবে পৌঁছায় নাই, তাহারা তার অবচেতন মনের আকাশে ঈষৎ বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক মারিয়াই মিলাইয়া গেছে, সেই সকল দৈবী মুহূর্তের খবরও অবশেষে ধরা পড়িল অল্ডাসের অতর্কিত দরদী মনে।

তাই আমার মনে হয় আমাদের সমস্ত অনুমানকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া কালক্রমে হয়ত অল্ডাসের কাছে আমরা এমন সকল বস্তুও পাব, যাহাতে চিন্তা, বুদ্ধি এবং মনের বিকাশের সহিত হৃদয়ের রসবোধও তৃপ্ত হয়।

[অল্ডাস্ হাক্স্‌লি

[সাত]

কয়েকদিন প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল, সেই দুঃসহ শীতের অবসানের পর প্রথম ফাল্গুনের ঈষত্তপ্ত বাতাস এবং আকাশের ঘন নীল মনের উপর একটি মোহজাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছিল। শ্রীমতী দীপ্তি কি একটি বহির ভূমিকা-অংশ অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িতেছিলেন, সমী নিকটে আসিয়া কহিল,—উপন্যাস খানার চেয়ে উপন্যাসের ভূমিকার প্রতিই যে দেখিতেছি তোমার বেশি মনোযোগ। দীপ্তি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তেমনি নিবিড় মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিল এবং পড়া শেষ হইয়া গেলে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমাদের আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা ত্রুটি এই যে আর্টের সহিত আমিত্বকে সে এমনি ওতপ্রোত করিয়া ফেলিয়াছে যে সেইটুকুর বাহিরে দৃষ্টি আর তাহার অগ্রসর হইতেছে না। তাই ভাষা তাহার যতই মার্জ্জিত সুচিক্কণ ঝক্‌ঝকে তকতকে হইয়া উঠিতেছে, ভঙ্গীর মধ্যে আসিতেছে যত নূতনত্ব যত স্বচ্ছন্দবেগ তবুও এমন কিছু সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে না যাহাতে হৃদয় গভীর কোন আশ্রয় পায়।

সমী—হঠাৎ এমন কথাটা তোমার মনে হইল কেন ?

দীপ্তি—মনে হইবার কারণ একটু আছে বই কি! এখনই রোম্যাঁ রঁলার 'আনেৎ-এগুসিল্‌ভি' উপন্যাসের ভূমিকা পড়িতেছিলাম, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "When I write a novel, I choose a human being with whom I feel certain

affinities,—or, rather, he chooses me. Once this person has been selected, I leave him perfectly free, I beware of mingling my personality with his. A personality that one has borne for more than half a century is a weighty burden. The divine boon of art is to deliver us from this burden, by giving us other souls to quaff, other lives to assume."—তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যেই আর্টের সকলের চেয়ে বড় তত্ত্ব নিহিত আছে। এবং আমাদের আধুনিক সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে এই কথাটাই এখন ভুলিয়া বসিয়া থাকিবার যো হইয়াছে। আজকালকার উপন্যাসের বেশির ভাগ বইয়ের পাতা ওলটাও, দেখিতে পাইবে যিনি লিখিয়াছেন তাঁহারই 'আমি'টাকে লইয়া নানা ভাষায় নানা ভঙ্গীতে রঙচঙ্গে করিয়া সাজাইবার প্রয়াস। খুব দুর্লভ দুই এক স্থান ছাড়া কোনখানে একনিমিষের জন্যও তাঁহারা নিজেদের এই আমিটাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

সমী—এই 'আমিত্ব'কে পরিহার করা লইয়াই তো জগতে যত বড় বড় ট্র্যাজেডি। শুধু আর্টের মহলে কেন জীবনের মহলে, প্রেমের মহলে সর্ব্বস্থানে এই 'আমি'কে লইয়াই যত গোলমাল। আমার তো মনে হয় প্রেমের ক্ষেত্রে আমাদের সকলের চেয়ে বড় আশা ভঙ্গের কারণ প্রেমাস্পদের সহিত নিজের আমিত্বকে জড়িত মিশ্রিত করিয়া ফেলা। কিছুদিন

স্বপ্নের ঘোরে চলিবার পর হঠাৎ যখন চমক ভাঙ্গে, তখন বড় বেদনায় চাহিয়া দেখি, এতদিন যাহাকে সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি, সে যে কে, তাহা কখনো চিনি নাই। নিজেকে দিয়াই তাহার আসল স্বরূপ আগাগোড়া ঢাকিয়াছিলাম।

দীপ্তি—আর্টের কথা পাড়িতেই তুমি তৎক্ষণাৎ আর একটা অবান্তর বিষয়ে চলিয়া গেলে। তুমি বড় বাজে ব'ক।

সমী—ঠিক বাজে বকিবার জন্য নহে। তোমার প্রখর রসনায় এখনই আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে কতই না অভিযোগ উদ্যত করিয়া রাখিবে, তাই কিঞ্চিৎ আশঙ্কায় প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলাম।

দীপ্তি—তোমাব ভয়টা কিসের ?

সমী—ভয় তেমন কিছুই না, নিজের সম্বন্ধে সমালোচনা শুনিবার ভীরুতা মাত্র। তুমি তো জান, আধুনিক সাহিত্যে মাঝে মাঝে আমিও লিখিয়া থাকি।

দীপ্তি—তা লিখিলেইবা, যদি লিখিয়াও থাক, একটা কথা লইয়া আলোচনা করিবার কালে সেই কথাটাকে অহরহ মনে রাখিতেই হইবে ? আবার সেই 'আমি'কে লইয়া অহর্নিশ ব্যাপৃত থাকা ! দেখ আজকাল যে ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল নভেল, ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল লেখা প্রভৃতি কি একটা ধুয়া উঠিয়াছে এবং ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল্ শব্দটা উচ্চারিত হইবামাত্র আবেশে সবাই গদগদ হইয়া পড়িতেছে, তাহার আসল কারণটা আমার কী মনে

হয় জান? আজকালকার সাহিত্যিকদের সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আর্টের মধ্য হইতে 'আমিত্ব'কে দূরে সরাইয়া লইবার ক্ষমতা নাই,—তাঁহাদের ক্ষমতা আছে বরঞ্চ নিজের এই আমিটাকেই নানাপ্রকারে ফলাও করিয়া বক্তৃতা দিবার। তাই আজকাল ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল্‌ উপন্যাস বলিয়া একটা নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে—যে শব্দের কোন মানে হয় না।

সমী কিঞ্চিৎ আহত হইয়া কহিল: সত্যই কি মানে হয় না?

দীপ্তি—না মানে হয় না। উপন্যাসের মধ্যে আমরা ঔপন্যাসিকের বক্তৃতা খুঁজিনা। খুঁজি, তিনি তাঁহার প্রতিভার সজীব স্পর্শে যে সব চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারা সুখ দুঃখের আবর্ত্তনে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের মনে চিরপরিচিতের মত আসন গ্রহণ করিল কিনা।

সমী— কেন রবীন্দ্রনাথের গোরা, বিনয় কিংবা চতুরঙ্গের শচীশ কি কম বক্তৃতা করিয়াছিল?

দীপ্তি— কিন্তু গোরা ছাড়া সে বক্তৃতার একটি কথাও কি কাহারও মুখে মানাইত? সেই সমস্ত বক্তৃতা এবং মতামতকে কোনরূপে উদ্গীরণ করিয়া দিবার জন্যই গোরাকে খাড়া করা হয় নাই। গোরার মেঘমন্দ্র ব্যক্তিত্বের অনিবার্য্য প্রকাশ হিসাবেই সেই সব কথা, সেই সব মত, সেই সব বক্তৃতা ধ্বনিত হইয়াছিল।

সমী—তুমি কেবল রোঁলার কথা আর রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছ, কিন্তু জান কি আর্টে 'আমিত্ব'কে একেবারে বর্জ্জন

করা কত শক্ত কাজ? আর সেজন্য কত বড় প্রতিভার প্রয়োজন হয়? রবীন্দ্রনাথ যখন হিবার্ট লেক্‌চার দিয়াছেন তখন তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অত রহস্যময় অত বিরাট বলিয়া মনে হয় নাই যেমন মনে হইয়াছে যখন গল্পগুচ্ছের মানভঞ্জন গল্পে গিরিবালার চুল বাঁধিবার বাক্‌সের নিখুঁত বর্ণনা পড়িয়াছি, যখন নষ্টনীড়ের চারুলতা তাহার প্রথম লেখা অমলকে পড়িতে দিবার সময় পান সাজিতে বসিয়া খয়ের দিতে ভুলিয়া কহিতেছে, "যাও, আর ঠাট্টা করতে হবেনা।"—দৃষ্টিদান গল্পে সেই যেখানে আছে, "সন্ধ্যা বেলা অদূরে কোথা হইতে হাম্বা ধ্বনি শুনিতে পাই,—তখন মনে পড়ে, মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেই সঙ্গে ভিজা জাব্‌নার ও খড় জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং শুনিতে পাই পুকুরের পাড়ে বিদ্যালঙ্কারদের ঠাকুর বাড়ী হইতে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ আসিতেছে।"—এই অপূর্ব্ব পল্লীচিত্র যখন পড়ি, তখন বিস্ময়বিমুগ্ধ মনে ভাবি, নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্ব সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা রুচি এবং আমিত্বকে কেমন করিয়া একান্ত অসংসক্ত ভাবে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিলে তবে এমন করিয়া সত্য ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়া উঠে। শরৎচন্দ্র যে আজ নির্ব্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর এমন করিয়া মনোহরণ করিয়া লইয়াছেন তাহার সবচেয়ে বড় কারণ তিনি কোনখানে তাঁহার সৃষ্টিকে ঠেলিয়া নিজেকে জাহির করেন নাই। তাই যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন সে সমস্তই মনকে এমন অব্যবহিত

ভাবে স্পর্শ করে। সেইজন্যই বাংলা সাহিত্যের আঁতি পাঁতি সন্ধান করিয়াও "মেজদিদি"র সেই প্রথম লাইনটি, "কেষ্টার মা মুড়ি কড়াই ভাজিয়া চাহিয়া চিন্তিয়া তাঁহার কেষ্টধনকে চৌদ্দবছরেরটি করিয়া মারা গেলেন—" এমনই একটি তুচ্ছ অথচ এমনি একটি অনির্ব্বচনীয় লাইনের সন্ধান বড় বেশী মিলিল না।

দীপ্তি অভিভূত হইয়া কহিল : তুমি ঠিকই বলিয়াছ। শরৎচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের নিকট যে কতদূর আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আর্টের নিকট হইতে তাঁহার আমিত্বকে কতদূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন বিন্দুর ছেলে হইতে একটি মাত্র লাইনের উল্লেখ করিলেই তাহা কতই না সুস্পষ্ট হইয়া যায়। সেইযে যেখানে ছোটযা বিন্দুর সহিত কলহ করিয়া অন্নপূর্ণা স্বামীকে রাগের মাথায় কহিতেছেন, "মাগ্ ছেলেকে খেতে দেবার যার ক্ষমতা নেই, তার গলায় দেবার দড়ি জোটেনা ?" এখানে যদি কোন অতিশয় মাজ্জিত রুচি 'মাগ ছেলে' ওই দুইটি গ্রাম্য ভাষার পরিবর্ত্তে "স্ত্রী, পুত্র" বসাইয়া দেয় আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি অন্নপূর্ণার চরিত্রের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য যায় নষ্ট হইয়া। তোমাদের আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগটা কোথায় জান ? তোমরা বড় egoist, নিজেদের কথা নিজেদের সমস্যা নিজেদের রুচি লইয়াই বকিয়া মর। ফলে যাহা সৃষ্টি হয় তাহা না প্রবন্ধ, না গল্প, না বক্তৃতা, না ডায়েরি, না তাহা তোমাদের সেই অতি গর্ব্বের ইন্‌টেলেক্‌-চুয়্যাল্ নভেল ;—জিনিষটা কী যে হইয়া দাঁড়ায় তাহার বিন্দু-বিসর্গ বুঝিতে পারিনা।

অথচ এই সহজ কথাটা ভুলিয়া থাক, এমনতরো পাণ্ডিত্যপূর্ণ থিসিস লিখিতে যত শক্তির দরকার হয় সেটা বকার শক্তি, আর জীবন্ত মানুষের চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদেরই সুখ দুঃখ হাসি কান্নার লীলার মধ্য দিয়া জীবনের নানা অসঙ্গতি নানা সমস্যা নানা রহস্যের দিকে ইঙ্গিত প্রসারিত করিয়া দিতে হইলে যে ক্ষমতার প্রয়োজন হয় সেটা আর্টিষ্টের শক্তি।

আমি জানি, আজকালকার অনেক খ্যাতনামা আধুনিক সাহিত্যিক এই মর্ম্মে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, 'লিখিয়া কেবল নিজের মনের খানিকটা আকাশে ওড়া, খানিকটা আপন মনে মনের পেখম ওড়ান এ ছাড়া আর কী লাভ! আমরা যাহা লিখি সারা দেশে তিনজনেও কি তাহা বোঝে? তাহা পড়িলে কি ডেপুটি গিন্নীর ঘুম পায়না? তাহা পড়িলে কি আই-সি-এস-জায়ার হাই ওঠে না?' বুঝিতে পারিনা তাঁহাদের এ ক্ষোভের অর্থ কি? আমার কথা সকলের কথা করিয়া তুলিব আর্টিষ্টের সবচেয়ে বড় পণ কি তাহাই নহে?

সমী মৃদুমন্দ হাসিয়া কহিল: আমার কথা ডেপুটি গিন্নীরও কথা করিয়া তুলিব এমন পণ যদি করিতে হয়, তবে হে দেবি, তোমার কাছে শপথ করিতেছি আজ হইতে লেখক বৃত্তি ছাড়িলাম।

দীপ্তি কিঞ্চিত রাগ করিয়া কহিল: তা শপথ কর গিয়া। আমি নিশ্চয়ই জানি তুমি না লিখিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না।

কিন্তু প্রভাতবাবুর ছোটগল্পগুলির কথা একবার মনে করিয়া দেখ তো। সে ধরণের গল্প কুড়িহাজারের চেয়ে বেশি কাটতি

এমন মাসিকপত্রের গ্রাহিকারাও পড়ে, এবং পড়িয়া হাই তোলেনা। অথচ তাঁহার 'দেশী ও বিলাতী'র অপূর্ব্ব ছোটগল্প-গুলিতে রসের এবং জীবনের নানা গভীর ও অগভীর দিকের ইঙ্গিত-প্রয়াসের যে অভাব আছে এমন কথা বলিতে পারনা। আসলে আসল আর্টিষ্টের ক্ষমতা এইখানেই। অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ ভঙ্গীতে তিনি জীবনকে আঁকিবেন। জীবন দিয়াই জীবনকে স্পর্শ করা যায়। ভাষা আর ভঙ্গীর কারিকুরি দিয়া নয়।

সমী—প্রভাতবাবু, রবিবাবু, শরৎবাবু ইহাদের কথা তো গেল। এখন আমি ভয়ে ভয়ে একটা কথা নিবেদন করি?

দীপ্তি—বলনা।

সমী—প্রভাতবাবু যখনকার কালে লিখিয়াছেন সেকালের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মানুষের জীবনের দুঃখ, জটিলতা, আকুতি, আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান এত বাড়িয়াছে যে আমার মনে হয় সেকালের একজন শিক্ষিত যুবকের সুখ এবং দুঃখের সীমা যতদূর ছিল এখন তাহার সহিত বোধকরি আর তুলনাই হয়না।

দীপ্তি—আহা, কি একটা কথাই বলিলে!

সমী—ঠিক কথাই বলিয়াছি দেবী!

দীপ্তি—তাই যদি হয়, তবে তোমাদের আধুনিক সাহিত্যে কোথায় তোমাদের সেই আধুনিক মনের অপরিসীম দুঃখ এবং অন্তহীন আনন্দের ছবি?

সমী—তাহা যে নাই, আমাদের মনের অবিশ্রান্ত তরঙ্গাঘাতকে আমরা যে নিজেদের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতে দিতেছি,

আমরা যে চিরকালের সৃষ্টি পটে তাহাকে ফুটাইয়া রাখিতে পারিতেছি না সে'ও আমাদের দুর্ভাগ্য।

দীপ্তি—দুর্ভাগ্য কোন্ কারণে?

সমী—তাহার কারণ আমরা বিচ্ছিন্ন, আমরা একা। সৃষ্টিকার যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি একা একথা সত্য বটে। কিন্তু একথাও সত্য যে সমস্তদেশের চিত্তশক্তি এবং প্রাণশক্তির মধ্যে একটা নিগূঢ় সংযোগ একটা নিভৃত মিলন থাকিলে তবেই সৃষ্টির শতদল একান্ত স্বাভাবিকভাবে নিজকে মেলিয়া ধরিতে পারে। আজ আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত এবং স্বাধীন চিন্তায় সক্ষম লোকের সহিত অজস্র সাধারণমনা জনসাধারণের প্রভেদটা এত দুস্তর এত নিষ্ঠুর রূপে দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে কোনখানে কাহারও সহিত কাহারও আর এতটুকু যোগ নাই। অন্যদেশের সহিত নিজেদের দেশের এই তফাৎটা যখন অগ্নির অক্ষরে চোখের সুমুখে ফুটিয়া উঠে তখন এক একবার সমস্ত মনটা হায় হায় করে। এই সেদিন অল্ডাস হাক্সলির 'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট' বলিয়া একখানা উপন্যাস পড়িতেছিলাম, বইখানা এত সুন্দর অথচ এত গভীর এবং শক্ত বই! তাহা গ্রীষ্মের দিনে শার্সি-খড়খড়ি বন্ধ করিয়া মাথার উপর পাখা চালাইয়া দিয়া আধপাতা পড়িতে না পড়িতে ঘুমে ঢলিয়া পড়িবার মত বই নয়। আমাদের দেশ হইলে অমন বইয়ের পাঁচকপি কাটিত না। কিন্তু বইখানার এডিশনেরও অন্ত নাই। এইটুকু হইতেও বোঝা যায় চিন্তাশক্তি এবং

কাল্‌চার ওদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও কেমন ব্যাপ্ত। হাওয়া যেমন অদৃশ্যে থাকিয়া আমাদের নিশ্বাস যোগায়, আমরা যতই কেননা বড়াই করি, সর্ব্বমনের সহিত আপন মনের এই সহানুভূতিময় প্রবুদ্ধ সংস্পর্শ, এই বস্তুই অদৃশ্যভাবে সৃষ্টির অগ্নিকে রক্ষা করে।

আজ আমরা, এদেশের-দুর্ভাগ্য-সাহিত্যিকেরা, সেই সংস্পর্শ সেই মিলনের রেশ কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাই কখনো অভিমান করিয়া বলিতেছি, চাইনা মিলন, একাকী অন্ধকারেই থাকিব। কখনো খুব একটা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কহিতেছি, ডেপুটি গিন্নীর হাতের তেলোর চাপে চ্যাপ্টা হইয়া উক্ত গৃহিণীর সার্দ্ধ তিনপ্রহর ব্যাপী দিবা নিদ্রার সহিত সমানে ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া পড়িয়া থাকা—এইতো আমাদের বইয়ের ললাট-লিপি! তা হৌক গিয়া। সারা বাংলাদেশে তিনজন লোকেও যদি আমাদের বই ঠিক ভাবে বুঝিতে পারে তো সেইটুকুই যেন আমরা ভাগ্য বলিয়া মানি।

এমনি করিয়া আমরা যাহা সৃষ্টি করিতেছি তাহা সকলের সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে না বলিয়াই নিজেদের মধ্যে নিঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা কখনো বা কষিয়া অভিমান করিতেছি, কখনো ক্ষোভ করিতেছি, কখনো আহত গর্ব্বের সহিত নিরতিশয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছি, কখনো বা আমাদের আচরণ হইতে খুব একটা উৎপীড়িত তেজ বিচ্ছুরিত হইতেছে,—কিন্তু যাহা কিছুই করিতেছি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। আমাদের সমস্ত শক্তি

বিচ্ছিন্ন সব প্রয়াস একক ও সমস্ত আবেগ খণ্ডিত হইয়া ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। সমস্তই আছে প্রস্তুত, উপকরণের অভাব নাই, কিন্তু দেশের হৃদয় হইতে প্রতিফলিত কোন একটা দিব্য আলোক আমাদের যাহা কিছু আছে সে সমস্তকে উজ্জ্বল অনির্ব্বচনীয় করিয়া তুলিতেছে না। সহানুভূতির যেটুকু শীতল বাতাস আসিয়া লাগিলে ভাবের বাষ্প পুঞ্জীভূত বৃষ্টিধারার আকারে নামিয়া আসিতে পারে তাহা কিছুতেই জুটিতেছে না। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা, তাঁহাদের মত প্রতিভা দেশে দেশে কালে কালে দুর্লভ। কিন্তু এমনতরো সূর্য্যের আলো ছাড়াও সাহিত্যাকাশে অনেক চাঁদের আলো আছে যাহাদের উপর জনসাধারণের হৃদয়াধার হইতে বিচ্ছুরিত আলো আসিয়া পড়িলেই তাহারা ভাস্বর হইয়া উঠে। নিজেদের মধ্যে বদ্ধ হইয়া অন্ধকারে কেবল নিজের আমিত্বটাকে লইয়া যাহারা নিরন্তর অস্থির হইয়া উঠিতেছে তাহারা যদি একবার এই বাঁধন কাটিয়া ফেলিয়া বিশ্বের সহিত আপনার যোগ সাধন করিতে পারে তাহা হইলেই খুঁজিয়া পায় তৃপ্তি ও মুক্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যোগবন্ধন তাহারা কিছুতেই স্থাপিত করিতে পারিতেছে না। এই বাধার সকলের চেয়ে বড় কারণটা গুপ্ত হইয়া আছে আমাদের দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মূঢ়তা, অশিক্ষা এবং অজ্ঞানের উপর।

দীপ্তি—তাই নাকি? তা শিক্ষাকার্য্যের আমূল সংস্কারটা কোন্‌দিক হইতে হইবে? এবং 'জনসাধারণ' নামে এক বিরাট

ব্যক্তির মনকে গড়িয়া তুলিবার ভারই বা কে লইবে? বলি, উপায়টা ঠাহর করিয়াছ কি?

সমী—সর্ব্বনাশ! ও কাজ তো সমাজ সংস্কারকের। আমি নগণ্য সাহিত্যিক মাত্র। তাই এইখান হইতেই বিদায়।

দীপ্তি—আজ তুমি বিদায় লইতে চাহিতেছ বটে, কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, দেশের এই সব চেয়ে কঠিন কাজটার ভার তোমাদের মত নগণ্য সাহিত্যিকদেরই একদিন লইতে হইবে। শক্ত বলিয়া ছুটি নিবে, তোমাদের এমন সাধ্য কি!

[আর্ট ও আমিত্ব